


167.7



মোহন-মালা ।

(মায়া, লীলা, প্রায়শ্চিত্ত ও গণনা ।)

নূতন সংস্করণ ।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত ।

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা ।

শাখ, ১৩০২ ।

মূল্য ৯০ আট টাকা ।

কলিকাতা,

২০ নং স্কিয়া স্ট্রীট, “কালিকা যন্ত্রে”

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।

পরম ভক্তি-ভাজন

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

মহাশয়কে,

তদীয় ভক্তের

এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

“মোহন-মালা”

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত

উপহার

প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন ।

কাব্যমোদী সহৃদয় পাঠক বে, আমার “মায়া”কে এত স্নেহে চক্ষে দেখিয়াছেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। “মায়া”র আকার অতি ক্ষুদ্র হওয়ায়, এই নূতন সংস্করণে, “মায়া”র সহিত আমার আর তিনটি গল্প সম্মিলিত করিয়া, গ্রন্থের নামকরণ করিলাম,—“মোহন-মালা”। অপিচ, এই “মোহন-মালা” অথবা “মায়া,” “লীলা,” “প্রায়শ্চিত্ত” ও “গুণনা”য়, এবারও যদি আমি চিন্তাশীল পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারি, তবে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরন্তু, শীঘ্রই একরূপ এবং অন্যরূপ “মালা” লইয়া আমি তাঁহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইব, এমন ভরসাও রাখি।—আমার হৃদয়ে এমন “ছোট গল্প” অনেক মজুত আছে।

“মায়া”র সহিত তিনটি গল্প সংযুক্ত হইয়াছে;—সুতরাং গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির সহিত গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই নূতন সংস্করণে, স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত করিয়াছি।

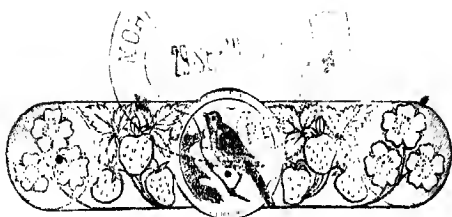
“মায়া”র প্রথম সংস্করণ পড়িয়া, বঙ্গের এক জন প্রধান সমালোচক ও দার্শনিক-পণ্ডিত আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পরম স্নান্য সহিত তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম।

“স্নেহাস্পদেষু।

তোমার “মায়া” বড়ই মনোহারিণী হইয়াছে।—মনুষ্যের মায়া নহে, ঈশ্বরের মায়াই অর্থ তুমি যেন যথার্থ বুঝিয়াছ, আর সেই ঈশ্বরের মায়া কিরূপে মনুষ্যের মায়ায় পরিণত হয়, তাহাও তুমি সুন্দররূপে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছ। আবার তোমার “মায়া”তে অপূর্ব কবিত্ব দেখিলাম। ফলতঃ তত্ত্ব-কবিত্বের মিলনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি বড়ই অপূর্ব—বড়ই উচ্চতরের হইয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।”



মোহন-মালা ।

মায়া ।

(১)

এক জনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের আলোকরাশি নির্দীপিত
হইল । দূরে দূরে ছিলাম,—সংসারে আকৃষ্ট ছিলাম না, বাধিয়া
রাখিবারও কেহ ছিল না,—আজ মনে হইতেছে, যেন সংসারে
কেহ ছিল, যেন এ হৃদয়ের সহিত আর একটি হৃদয় বাধা
ছিল,—সে চলিয়া গেল,—আমি মর্ম্মাহত হইলাম । উপরে
চাহিলুম, অনন্ত নীলাকাশ,—মেঘশূন্য, নির্মল ; নিম্নে স্বচ্ছ-
সলিলা গঙ্গা প্রবাহিতা ! জনমানবের কোলাহল নাই, চারি-
দিকে নীরবতা । এই নীরবতার মাঝে কি কোমল ও মৃদু
শান্তি বিরাজ করিতেছে ! কেবল আমিই হায়—এ কাতর
হৃদয়ে, এ শান্তির মাঝে অশান্তি !

এক দিন,—আজীবন অরণ্য সে দিন,—এক দিন বুকের ভিতর এক দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম ! আজ সেই স্বর্ণপ্রতিমা, এই অশানে রাখিয়া গেলাম ! যেমনই নীরবে, নিভৃতে পূজা করিয়াছিলাম, তেমনই নীরবে, নিভৃতে প্রতিমা বিসর্জন করিলাম ! কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না,—এই চিতাভস্মের ভিতর আমার বুকের হাড় রাখিয়া গেলাম ॥

চিতা জলিল। সে অপূৰ্ণ নৌন্দর্য্যরাশি চিতার আগুনে ছাই হইতে লাগিল। পাশ্বে দাঁড়াইরা নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। তেমন করিয়া চাহিয়া, হায় ! আর কখন দেখিতে পাই নাই।

একে একে আকাশের তারাগুলি নিবিল,—আমার চোখের জলে চিতার আগুনও নিবিল ! সকল আশা-ভরসা অশানভরা ভস্মের মাঝে বিলুপ্ত হইল ! ভাঙ্গা বুকে, গঙ্গাতটে, নিজ্জন অশানে বসিয়া রহিলাম। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, প্রভাত হইতে আর অল্পই বাকী। খুব শীতল বাতাস বহিতেছে। চিতা নিবিয়াছে ;—এই উত্তপ্ত ভস্মের মাঝে, খুঁজিলেও কি, হায় ! আর কিছুই মিলবে না ? চক্ষে আর জল নাই, বুকেটা ছুঁ করিতেছে !

কি আশা ছিল, তা' জানি না,—এত দিন কিছুই বুঝি নাই ! আজ মনে হইতেছে, হৃদয় অবলম্বনহারা হইল,—পৃথিবী একটা মহাশূন্য !

মহাম্যজীবন কি একটা প্রহেলিকা ? কেন এ মায়া ? এক জন্মেব উপর জীবনের এতখানি নির্ভর কেন ?

দূরে কে গায়িল। প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে গঙ্গাবক্ষে

লহরীগুলি জাগাইতেছে। নিঃস্রব্দ শ্মশান। সে দূরাগত মধুর গীতধ্বনি বড় মধুর লাগিল।

গায়কের নিকট একটি বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বীণাবল্ল ছিল ; তাহারই মধুর বন্ধারের সহিত সে মধুর কণ্ঠ মধুরতর হইল। নিঃস্রব্দ আকাশ, হাস্যময়ী প্রকৃতি,—কেবল আমার হৃদয়ের ভিতরেই মৰ্ম্মকাতরতা ! সে কাতর হৃদয়ে, গায়কের সে বৈরাগ্য-গান মধুরতর হইতে মধুরতম অনুভূত হইল। মুহূর্তের জন্ত শোক-তাপ ভুলিলাম ; মুহূর্তের জন্ত আত্মবিস্মৃত হইলাম ; দেশ-কাল-বৰ্ত্তমান ভুলিয়া, মুহূর্তের জন্ত, সে সঙ্গীত সুধার ডুবিয়া রহিলাম।

গায়ক শ্মশানে আসিলেন। পরিধানে গৈরিক বসন, দেহ ভস্মাচ্ছাদিত, হস্তে বীণা। প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি, সুপ্রশস্ত ললাট, জ্যোতির্ময় বিশাল নয়নযুগল, সুন্দর স্ত্রী। সমস্ত অবয়বে অনাসক্তির ভাব পরিব্যক্ত। নয়নে দিব্য জ্যোতি, অধরে মুছ হাসি। মাধুর্যা ও গাম্ভীর্যের সুন্দর সমাবেশ ! সে পবিত্র, সে স্বর্গীয় মূর্তি দর্শনে, সে চরণপ্রাপ্তে মস্তক আপনিই অবনত হয়। আমি চিনিলাম। বড় দুঃসময়ে ভগবান দেখা দিলেন ! ভক্তিতরে গুরুদেবের পবিত্রচরণে প্রণাম করিলাম। শান্তিহার্য ব্যথিত প্রাণ জুড়াইল।

তিনি তখনও গায়িতেছেন। গান, দেবভাষায় গীত হইতেছে। তাহার মৰ্ম্ম এই:—

“সুন্দর প্রভাত, সুন্দর সময়!—চক্ষু মেলিয়া বাহ্য দেখিতেছি, সকলই সুন্দর ! মানুষ কেন অসুন্দর থাকিবে ? প্রফুল্ল হৃদয়ে সবাই গায়িতেছে,—মানুষ কেন নিরানন্দ প্রাণে আবৃত্তন করিবে ? পবিত্র হৃদয়ে, পবিত্রতর হইতে পবিত্রতম যে ভগবান,

কেন না, তাঁহাকে স্মরণ করি ? সংসারের এই তুচ্ছ সুখ, এই মিথ্যা-জীবন—এই জীবনের এই ক্ষুদ্র সুখ হুঃখ,—মানুষের কি ইহাই চরম লক্ষ্য ? ক্ষুদ্র সুখ হুঃখ ভাজিয়া বাক, মোহ অপ-সারিত হোক, সঙ্কীর্ণতা দূর হোক ! মানুষ জাগ্রত হও, পবিত্র হও, নবজীবন লাভ কর !”

ধীরে, অতি ধীরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উঠে, আরও উঠে, আরও উঠে সে মধুর কণ্ঠ উঠিল। সে সময়ে, সে দেবসঙ্গীত যাহারা শুনি, তাহারা ধত্ত হইল; সে সঙ্গীতে যাহারা জাগিল, তাহারা আরও ধত্ত হইল ! যথাসময়ে গান থামিল; আমি আবাম ভক্তিভরে, সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম।

তিনি স্নেহে বলিলেন, “বৎস ! এখনও এখানে কেন ?”

কিছুই বলিলাম না,—বলিতে পারিলামই না। কিছু ক্ষণের পর, বুকটা আবার হহ করিয়া উঠিল, হৃদয় ফাটিয়া অশ্রুরূপে শোণিতধারা নির্গত হইল। পতিতপাবন হাত ধরিয়া কহিলেন, “বৎস ! এইবার তুমি জীবন পাইবে !”

সাশ্রনয়নে, নির্দোষিত চিত্তভ্রমপানে তাকাইয়া কহিলাম, “প্রভু, আমার জীবন ? সে ত এইখানেই পুড়িয়া ছাই হইয়াছে !”

অন্তর্যামী হাসিলেন। বলিলেন, আসক্তি ও মায়া এইখানে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে ! এখন আইস,—এইবার তুমি নবজীবন লাভ করিবে !”

গুরুদেব অগ্রবর্তী হইলেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। চলিতে চলিতে একবার জন্মের মত সে পবিত্র স্থান দর্শন করি-লাম, গুরুদেবের মত সে স্থানে আর একবার অশ্রু ত্যাগ করিলাম। জীবনে, সে স্থানে, আর একবার মাত্র আসিয়াছিলাম।

যাইতে যাইতে আর একবার দাঁড়াইলাম । শ্মশানের পানে
চাহিয়া, মনে মনে এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম ;—

“প্রশান্ত গম্বীর স্থির বিজন অশান ।
অনন্ত কালের সাক্ষী পবিত্র মহান ।
প্রেম-শিক্ষাদাতা, বন্ধু, মুক্তির সোপান ।
তুমি সত্য, নিত্য, ধ্রুব, বিজয়-নিশান ।
পাপদর্প-শল্যকারী নতোর বিকাশ,
তোমার নাহায়ে হৃৎ ধর্মের প্রকাশ ।
পরিণাম—তুমি হান, মহা-সঙ্কলন ।
চিতা-ভস্ম স্মৃতি রাগ হরিনাম গান ।
চির শান্তি সাম্য-মোতি ভুবনবিদিত,
‘অনিত্য-সংসার’-শিক্ষা তোমাতে নিহিত ।
আলিঙ্গক, মহা গুরু, নমি তব পায় ।
হে গগান, কর জাগ, বন্ধন-কারার ॥ **

শরীর রোমাঞ্চিত হইল ; অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া গেল ।
ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, অরিতপদে, গুরুদেবের অহুসরণ
করিলাম ।

(২)

বিদ্যাচলের পদপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কানন । কাননভ্যন্তরে
একখানি ক্ষুদ্র কুটীর । সেই কুটীরে গুরুদেব আমাকে শিক্ষা
দিতেন । পুরাণ, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি, গুরুদেবের কৃপায়,
কিছু কিছু আমার আয়ত্ত হইলো লাগিল । সংসারের অনিত্যতা
বুঝিতে লাগিলাম । গুরুদেব বুঝাইয়া দিয়াছেন, অস্বপ্নজ্ঞানের

* মদ্রিচিৎ “জুন” নামক কবিতা-পুস্তক হইতে এই কবিতাটি গৃহীত ।

উপরই ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ;—আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত যত্ন করিতে লাগিলাম ।

অসমভাবে এক মুহূর্তও অতিবাহিত না হয়, এজন্ত নিয়তই তিনি কোন-না-কোন কার্যে আমাকে নিযুক্ত রাখিতেন । এত করিয়াও তবু অতীতের কেবল একটি স্মৃতি ভুলিতে পারিলাম না । একখানি ক্ষুদ্র মুখ—লাবণ্য, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার আধার একখানি ক্ষুদ্র মুখ, এই আঁখি দু'টার মাঝে নিয়তই জাগ্রিত ! প্রাতেঃ পুষ্পচরন করিয়া, ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতে বসিতাম,—ইষ্টদেবতা এ ক্ষদয়ে আসন না পাইয়া, সেই প্রেম-মগ্নী স্মৃতি, হৃদয়ের সমস্ত স্থানটা যুড়িয়া লইত ! অঞ্জলিবদ্ধ কুসুমরাশি অশ্রুসিক্ত হইয়া, বালার কোমল চরণে উৎসর্গীকৃত হইত ! সন্ধ্যাকাশ-তলে গঙ্গাতটে বসিয়া, সন্ধ্যা-বন্দনাদ ঈকব্রিত্যে,—মনঃসংযোগ হইত না,—গঙ্গালহরার সহিত নয়নাশ্রু মিশাইতাম ! দুর্কলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল ।

গুরুদেবের উপদেশ কি সকলই বার্থ হইল ? বুঝিতাম না যে, তাহা নহে । বুঝিয়াও কিছু প্রাণে বল পাইতাম না । মায়ায় খেলা বলিয়া সকলই অনুভব করিতাম । কিন্তু মায়া আতিক্রম করিতে পারিতাম কৈ ? হুঃখ এই, সাব করিয়াও যে, মায়া কাটাইতে চাহিতাম না ! এই মায়ায় রাজত্বে যদি অনন্ত বস্ত্রাও থাকে, বুক পাতিয়া তাহা লইতে সাধ যায় ! কেন এমন হয় ? সেই ক্ষুদ্র বাহু দু'খানির মধ্যে জন্ম জন্ম বন্দী থাকিতে পাইলেও কৃতার্থ হই ! কেন ? একি দুর্কলতা ? এত বুঝিলাম, এত শিখিলাম, বুঝি-হইল ? জীবনে এত দুর্কলতা কেন আসিল ? জীবনের উচ্চ আদর্শ চক্ষের সম্মুখে,—হায়, কেন তাহা হেলায় হারাই-

তেছি! আপনার সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনিই ক্ষতবিক্ষত হইতেছি;—হার, ভুলিতে কি পারিব না? ধৃত্য সে মহাত্মা, বিস্মৃতি যার আয়ত্তবাহিন;—কোটা কোটি প্রণাম তাঁর শ্রীচরণে,—জীবনসমগ্র প্রিয়জনৈর স্মৃতি, যিনি অন্তর হইতে এককালে অন্তর্হিত করিতে পারেন!

গুরুদেব সব বুঝিলেন। কত সারগর্ভ, অমূল্য উপদেশ দিলেন; কিন্তু সকলই বৃথা হইল। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারনাম, “প্রভু, সব বুঝিতেছি, তবু দুর্বলতা ঘুচিতেছে না কেন?”

তিনি বলিলেন, “তোমার পূর্বজন্মের সংস্কার।

ব্যথিত-হৃদয়ে কহিলাম, “এ যন্ত্রণার কি, তবে অবসান নাই?—ভুলিতে কি পারিব না?”

তিনি ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসিতে যেন প্রকৃতির একটী সূচ রহস্য উল্কাটিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন, “ভুলিতে পারিবে না? কেন পারিবে না? এই নীলিমাময় অনন্ত আকাশ, এই উদার পৃথিবাতল, এই অসংখ্য জীব-জন্তুপরিপূরিত প্রাণি-জগৎ—এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পর্ব্বত, সমুদ্র ও বিবিধ বৃক্ষরাজি-পূর্ণ শ্রামলা মেদিনী,—কেন, ইহাপেক্ষা সুন্দর কি, সেই বালিকার মুখখানি? এই জগতের অভ্যন্তরে যে মহাপ্রাণ,—তাঁহার কাছে কি বালিকার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু? যে মহাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া কোটা কোটা সৌরজগৎ—কোটা কোটা ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, তাঁহার জ্ঞান—তাঁহার ধ্যান অপেক্ষা কি, সেই বালিকার মুখমণ্ডল চিন্তা করা অধিক সুখের? এই অনন্ত

সৌন্দর্য্য—অনন্ত জ্ঞানের নিকট কি, সেই বালিকার ক্ষুদ্র রূপ ? কেন,—মানুষ কি সামান্য ? সাধনার বলে, এই ক্ষুদ্র মানুষ কত মহৎ হয় ! সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাপ্রাণে, মানুষ আপনার ক্ষুদ্র প্রাণ নিমগ্ন করিতে পারে ! তন্ময়চিত্ত হইয়া, আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান বিস্তৃত হইতে পারে ! একি সামান্য ব্যাপার ? যদি সেই মহাসিদ্ধিতে এ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু বিসর্জন করিতে পার, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা আর কি সুখ আছে ? এ সুখের বিনিময়ে, পার্থিব কোন পদার্থ, কি দিতে পারে ? সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিনিময় করিলেও কি, এ সুখের পূর্ণতা হয় ? বৎস ! অধীর হইও না,—আত্মহারা হইয়া ঈনজা শব্দ চরণে দলন করিও না ! সংবনা হও,—সংযম ব্রত শিক্ষা কর ! আত্মসংযম যোগীর লক্ষণ । মানুষমাত্রেই হইবে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও যোগীর ভাব থাকিবে । তুমি বুদ্ধিমান,—সংবনা কর, অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবে !”

পতিতপাবনের আশ্রয় বাক্যে, আমার সন্মুখের রোমাঞ্চিত হইল । দরবিগলিতবারে আনন্দাশ্রু পড়িয়া, আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল । কৃতজ্ঞতায়, মন্তক আপনা হইতেই সেই মহাপুরুষের চরণে লুপ্ত হইল । কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের পাদপদ্ম বরিয়া কাঁহলাম, “দয়াময় ! যখন এতদূর দয়া করিয়াছেন, তখন আর এ অধমকে বঞ্চিত করেন কেন ? প্রভু, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিন, কিরূপে আমি এ নান্য ও আসক্তির হাত এড়াইব ?”

অন্তর্যামী, আমার অন্তর বুঝিলেন । প্রথমে একটু হাসিলেন, পরক্ষণেই ধীরগম্ভীরভাবে কহিলেন, “বৎস ! অধৈর্য্য হইও না ; তোমার শুভ প্রারম্ভ দেখা দিয়াছে । মায়্যা ও আসক্তি

সকল অনর্থের মূল বটে, কিন্তু এট মায়া ও আসক্তি হইতেই, আবার সময়ে, সফল লাভ হয়। সংসারের সকল বস্তুতেই এই নিয়ম খাটে। দেখ, বে হলাহল সেবনে মানুষের আশু-মৃত্যু ঘটে, অবস্থা বিশেষে, সেই হলাহলই আবার মানুষের সঞ্জীবনী শক্তি হয়। তোমার এই আসক্তি ও মায়াও তোমাকে সেই-রূপ সফল প্রদান করিবে। তাই বলি, বৎস! হতাশ হইও না। প্রাণপণে সাধনা কর। সাধিলে, অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।”

কিন্তু এ কথায়ও আমি নিঃসংশয়চিত্ত হইতে পারিলাম না। অন্তর্যামী তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, আমাকে অটল বিশ্বাসে বলীয়ান করিতে না পারিলে, আমার আর পরিত্রাণ নাই। দয়াময় দয়া করিলেন। দেহমাথাস্থরে, আমার অঙ্গে পদ্মহস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন, “প্রবোধ, তুই ধন্ত ! তোর পিতামাতাও ধন্ত ! আর ধন্ত আমি যে,—

বলিতে বলিতে গুরুদেবের সেই বিশাল চক্ষু আরও বিস্তারিত হইল; সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আবার কহিলেন, “আর ধন্য আমি যে, বৎস ! তোমার মত শিষ্যরত্ন লাভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, এই ‘মায়া’-প্রভাবেই, অচিরাৎ তুমি, সর্বভূতেই সেই মহামায়ার প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবে ! বৎস ! তোমার পূর্বজন্মের স্মৃতি আছে ;—সাধনা কর, অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবে।”

আমি পরম পুলকিত হৃদয়ে, ভক্তিভরে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। কৃতজ্ঞতায় আমার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গুরুদেব পুনরপি কহিলেন, “যাও বৎস, গৃহ যাও,—

জননী-জন্মভূমি দর্শন কর। এইবার তোমার পরীক্ষা হইবে। ঠিক আর এক বৎসর পরে, ঐ স্থানে,—যেখানে তোমার নব-জীবনলাভের সূত্রপাত হইয়াছে,—সেই মহাস্থানে আমার দর্শন পাইবে! সেখানে তোমার আমার মহামিলন হইবে!”

এই বলিয়া, পতিতপাবন ভগবান বীণায় ঝঙ্কার দিলেন। সেই মধুর ঝঙ্কারে কণ্ঠ মিলাইয়া জয়দেবের সুধার-সমুদ্র মহন করিতে লাগিলেন ;—

প্রলয়পষোড়িশ্রলে ধৃতবানসিবেদং

বিহিতবহিজচরিত্রমখ্যেদং ।

কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

গান গায়িতে গায়িতে গুরুদেব ভাবে তন্ময় হইলেন। আঁগ, সে মূর্তি কি সুন্দর! মনে হইলে এখনও আমার স্তদেয় প্রেমের প্রস্রবণ-বহিতে থাকে। গুরুদেব গায়িতে লাগিলেন ;—

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে

ধরণিধারণকিণচকগরিষ্ঠে ।

কেশব ধৃতকৃৎনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

বসতি দশনশিগরে ধরণী তব লগ্না

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।

কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

তব করকমলবরে নখমঙ্কুতশৃঙ্গং

দলিতহিরণ্যকশিপুতমুভৃঙ্গং ।

কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমঙ্কুতবামন

পদনখনীরজনিতজনপাবনং ।

কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

ক্ষত্রিয়কবিরময়ে জগদপগতপাপং

সপয়সি পয়সি শান্তিতভবতাপং ।

কেশব ধৃতভূক্তপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং

দশমুখমোলিবাং রমণীয়ং ।

কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

বহসি বপুসি বিশদে বসনং জলদাভং

হলহতিভীতিমিলিতবমুনাভং ।

কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ।

নিঃসি বজ্রবিধেরহহ প্রতিজাতং

সদয়হৃদয়াশতপশুঘাতং

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

শ্রেষ্ঠনিবহনিধনে কলয়সি করবাং

ধূমকেতুশিব কিমপি করবাং

কেশব ধৃতকঙ্কশরীর, জয় জগদীশ হরে ।”

গান থামিল । সে স্বর দিক্‌দিগন্তে ধ্বনিত হইল,—“জগদীশ হরে !” শ্রোতৃস্বতী কুলু কুলু স্বরে গায়িল,—“জগদীশ হরে !” অরণ্যের পশু পক্ষী, জীবজন্তু সে গানে চমকিত হইল ; মুগ্ধমনে গায়িল,—“জগদীশ হরে !” বিক্র্যাচল কাঁপিয়া উঠিল ; গম্ভীরনাদে গায়িল,—“জগদীশ হরে !” অনন্ত প্রকৃতিও যেন একতানে গায়িতে লাগিল,—

“জগদীশ হরে !”

স্বর্গে-মর্ত্তে তখন আর বুঝি কোন ব্যবধান নাই !

আমি আর তখন আমাতে নাই । আমিও হারাইয়া, তখন আমি যেন এই সঙ্গীত-সুধায় ডুবিয়া গেলাম ; পরানন্দ ভোগ

করিতে লাগিলাম। সে আনন্দ, কেবল অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে।

যথা সময়ে, গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই আদেশমত, স্বদেশ-যাত্রা করিলাম।

(৩)

এ অবধি আমার বিশেষ কোন পরিচয়, আমি দিই নাই। পরিচয় দিবারও বিশেষ-কিছু নাই। আমার এ দুঃখময় জীবন-কাহিনী কে শুনিবে? উপস্থানের কথা কিছুই নাই;—ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র-কাহিনী ;—তোমাদের ভাল লাগিবে কি ?

ভাগলপুর জেলার কোন একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে আমার বাস। জাতিতে ব্রাহ্মণ ;—আমার পূরা নাম,—প্রবোধচন্দ্র গঙ্গো-পাধ্যায়। হতভাগ্য আমি,—অতি শৈশবেই পিতা মাতাকে হারাইয়াছি। প্রাণ ভরিয়া পিতা-মাতার নাম উচ্চারণ করিতে পারি নাই।

সংসারে এক বিধবা পিসি ছিলেন,—তাঁহারই যত্নে লালিত-পালিত হইতে লাগিলাম। আমার পিতার অবস্থাও ভাল ছিল না,—কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে পিসি আমাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে আমি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। আমার স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। আমার স্বভাবও অতি মিনীত ছিল। এজন্য আমি শিক্ষকগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম। বিশেষ দুঃখীর ছেলে বলিয়া, সকলেই আমাকে দয়া করিতেন।

পথের পথিক অবধি আমাকে দয়া করে দেখিয়া, আমার স্বাভাবিক কোমল অন্তর, আরও কোমল—করুণাময় হইয়া উঠিল। • জগতে দয়ার এত আধিক্য দেখিয়া, আমার চক্ষে জল আসিত। কি উপায়ে রুতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়, জানিতাম না; তাই বিরলে বসিয়া শতধারে, আপন মনে বুক ভাসাইতাম।

ত্রেমরা আমাকে আশ্বস্তরী বা কপট ভাবিও না। নিজের মুখে নিজের প্রশংসাবাদ করিতেছি দেখিয়া, আশ্ববক্ষক ও লঘু-চেতাবোধে আমার দৃণা করিও না। প্রকৃত কথা বাহা,—অন্ততঃ • আমি বাহা বুঝিরাছি, অবিকল তাহাই বলিয়া যাইতেছি,—প্রবৃত্তি হয় ত শুনিয়া যাও।

অল্পদিনের মধ্যে আমি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। কোম্পানী হইতে “জল-পানি”ও পাইলাম। পিদীমার-আমার আনন্দের আর অবধি নাই,—তিনি আমার পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ষথাসময়ে আমি ইংরেজী ইন্সকুলে নিযুক্ত হইলাম। পাঁচ বৎসরের মধ্যে, প্রবেশিকার পাঠও সাঙ্গ করিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে, এ পরীক্ষায়ও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম।

ভূভাগ্যবশতঃ, এই সময়ে আমার পিতৃস্বসা ইহলোক পবিত্যাগ করিলেন। সংসার অন্ধকার দেখিলাম। সংসারে ‘আহা’•বলিতে আমার আর কেহ রহিল না। বাহাদের মুখ চাহিয়া মানুষ সংসারে মরে, বাঁচে; বাহাদের মায়ায় মানুষ আশ্ব-বিস্মৃত হয়; আমার সে বন্ধন আর কিছুই রহিল না। এই সময়ে আমার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র।

(৪)

এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে, আমার জীবনের এক বিপর্যায় ঘটিল। এইবার সেই কথা বলিব।

আমাদের বাটীর পার্শ্বেই একঘর মধ্যবিৎ গৃহস্থ বাস করিতেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম—উমাকান্ত মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কন্যা ছিল, নাম—মারা দেবী। মায়া দেখিতে বড় সুন্দর। চাঁদপানা মুখ, স্নকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব, সুকুঞ্চিত কেশরাশি,—সুরূপা, সুলক্ষণা। মায়া আমা অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট। শৈশবে আমরা একত্র খেলা করিতাম, একসঙ্গে বেড়াইতাম, উভয়ে মনের কথা মন খুলিয়া কহিতাম। আমরা উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিতাম। মারার জনক-জননীও আমাকে পুত্রের স্থায় ভাল বাসিতেন।

শৈশবের সেই খেলা-ধুলার সহিত আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন আমরা উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম, তখন আমাদের উভয়েরই দেখা-শুনা একরূপ বন্ধ হইল।

মায়ার পিতা কুলীন-কুল-চূড়ামণি। তাঁহার পাল্টি-ঘর বড়ই চম্পাপ্য। অনেক স্থলে পাত্রের অনুসন্ধান হইতে লাগিল; কিন্তু পাত্র মিলিল না। দেখিতে দেখিতে মায়া যৌবনসীমায় পদার্পণ করিল।

বাপ-মায়ের আহার-নিদ্রা উঠিল। শেষে অনন্তোপায় হইয়া তাঁহারা আমাকেই কন্যাদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

পিতৃ-মাতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই, একদিন মায়ার পিতা আমাকে প্রণামিয়া কহিলেন, “প্রবোধ, তোমাকে আমার একটি

কথা রাখিতে হইবে। বাবা, তোমাকে সন্তানের স্থায় দেখি,
—তাই তোমার উপর এতটা আধিপত্য করি।”

আমি বিনীতভাবে কহিলাম, “কি বলিবেন, বলুন ; আমার
সাধ্যাধীন হইলে, প্রাণ দিয়াও তাঁহা সমাধা করিব।

মায়ার মাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কঁাদ-কঁাদ
মুখে আমাকে কহিলেন, “বাবা, উনি আর বলিবেন কি,—
আমিই বলিতেছি,—মায়াকে তুমিই বিবাহ কর! মেয়ের
ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া, আমাদের আহা-নিদ্রা উঠিয়াছে।
আর ত মায়াকে আইবুড় রাখিতে পারি না, বাবা!”

মায়ার পিতা কহিলেন, “বাবা, ভাবিতেছ কি ? ব্রাহ্মণের
জাতি ও ধর্ম রক্ষা কর। বিপন্নকে দয়া করিলে, সেই বিপন্ন-
ভঞ্জনও তোমাকে দয়া করিবেন।”

আমি তথাপি কোন উত্তর করিলাম না,—উত্তর করিতে
পারিলামই না। অতীতের অনেক দিনের অনেক কথা, একে
একে আমার স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইল। “বি-বা-হ”! অতি
ধীরে ধীরে, এই প্রশ্ন মনে জাগিল।—“কেন?—ইচ্ছা করিয়া
এ মায়া ফাঁসি গলায় দিই কেন? সংসারে থাকিয়া, সংসারী
হইয়া, কে সম্পূর্ণরূপে ধর্মোপার্জন করিতে পারে? অর্থে ও
মহুয্যত্বে ত আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অর্থাৎ, সংসারী হইতে
হইলে, স্তূর্ণের বিশেষ আবশ্যক। তবে কেন ইচ্ছা করিয়া, সেই
পরমার্থলাভে বঞ্চিত হই?”

মনে মনে এই প্রশ্ন জাগিল। আর সেই জগুই নিশ্বাসটা
কিছু জোরে পড়িল।

মায়ার পিতা আমার মনের ভাব বুঝিলেন। তিনি বাংলা-

কাল হইতেই আমাকে জানিতেন ; আমার প্রকৃতি বিশেষরূপ বৃদ্ধিতেন। তিনি কিছু বিষয়ভাবে কহিলেন, “তবে কি বাবা, আমি ধর্ম্মচ্যুত—জাতিচ্যুত হইব ? বিপন্ন ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করার কি ধর্ম্ম নাই ?”

এবার আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একটু চক্ষুলজ্জা হইল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও একটু দ্রব হইল। বিনীত ভাবে, মাগ্নার পিতাকে কহিলাম, “আপনি আমার পিতার তুল্য ; আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য ! কিন্তু—”

মাগ্নার পিতা কহিলেন, “কিন্তু কি ? বাবা, তোমার হাতে ধরি, এ বিষয়ে আর অমত করিও না। আগামী শুভ দিনে, তোমাকে এ শুভকর্ম্ম করিতেই হইবে।”

আমি আর কোন কথা কহিতে পারিলাম না। আমার মৌনে, সম্মতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিছুক্ষণ পরে কেবল এই কথাটি কহিলাম, “আমাকে কন্ডাদান করিলে ত, আপনাকে ‘পতিত’ হইতে হইবে ! সমাজে ত, আপনার সম্মানের লাঘব হইবে !”

মাগ্নার পিতা কিছু ক্ষুণ্ণভাবে কহিলেন, “বাবা, তা জানি। কিন্তু কি করি, আর উপায় নাই।”

মাগ্নার মা কহিলেন, “সমাজ এমনেই বা উঁহাকে কি ‘ছাতা দিয়া মাথা’ রাখিয়াছে ! এই ত, মেয়ে পনরয় পা দিয়াছে, কে সে জন্ত একবার ‘আহা’ বলে ! বাবা, আমরা বোকা মেয়ে-মানুষের দ্বারা,—‘কুলীন’ ‘বংশজ’ অত-শত বুঝি না। বুঝি এই যে, মেয়ে হাতে সুপাত্রস্থ হয়, বাপ মায়ের আগে তাই দেখা দরকার। বাবা, তোমাকে আমি পেটের ছেলের মত দেখি ;—

তোমার মত স্বপাত্রে হাতে মাঝাকে সঁপে দিতে পারিলে, আমি আপনাকে সার্থক জ্ঞান করি।”

আর কথা-কাটাকাটি করা বৃথা বুঝিয়া, আমি মায়ার পিতার প্রস্তাবে সন্মত হইলাম। হায়, সেইদিন হইতেই আমার জীবনে এক নূতন তরঙ্গ উঠিল।

আমি, বিবাহ করিতে সন্মত হইলে, মায়ার পিতা মাতার আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আমাকে কত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। মায়ার মা আবেগভরে কহিলেন, “বাবা, তোমার শত বর্ষ পরমায়ু হোক। আজ তুমি যে কাজ করিলে, নারায়ণ অবশ্যই তোমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আশীর্বাদ করি, আমার মাঝাকে নিয়ে, তুমি ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর!”

আমি মাথাটি হেঁট করিয়া সকল কথা গুনিলাম।

অতঃপর শুভদিনে, শুভলগ্নে, আমাদের শুভ উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

(৫)

বিবাহের পর, আমি কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতে এলাহাবাদে গমন করিলাম। সেখানে আমার দূরসম্পর্কীয় এক মাতুল বাস করিতেন। তিনি সেখানকার একজন প্রসিদ্ধ উকীল। আমার লেখা পড়ার খরচ পত্রের তিনি অনেক সাহায্য করিতেন। শুরুর মহাশয়ও সময়ে সময়ে কিছু কিছু দিতেন। আমি সেখানে ঐশ্বর্য পড়িতে লাগিলাম। মায়া, পিতৃদল্লয়েই রহিল।

বাল্যকাল হইতেই আমি কিছু নির্জনপ্রিয়। স্বকুমার
সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতে আমি ভাল বাসিতাম।
অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, প্রাচীন কাব্য
ও হিন্দুধর্মশাস্ত্রের কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতাম। আমার পিতা
পরম বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের কুলধর্মও বিষ্ণু-উপাসনা।
বৈষ্ণবপতার পুত্র বলিয়াই হটুক, আর পূর্বজন্মের স্মৃতি-
বশতই হটুক,—স্বপ্নে অনুরাগ, দীপ্তিরে ভক্তি, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধা,
শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে বিশ্বাস, বাল্যকাল হইতেই আমার হাড়ে
হাড়ে—মজায় মজায় মিশ্রিত হইয়াছিল। মাতৃস্তন-দুগ্ধ পানের
সহিত ভক্তির আবাদ পাইয়াছিলাম। তাহার উপর আজীবন
শোক তাপ ও দারিদ্র্যদুঃখ আমার হৃদয়ের অলঙ্কার হইয়াছিল।
এইরূপ নানা কারণে শৈশবেই আমার মন উদাস হইয়া যায়।
গৃহে আমার মন বসিত না। সাংসারিক প্রলোভন আমাকে
আকৃষ্ট করিতে পারিত না। মনে হইত,—“কেন এ জীবন?
কোথা হইতে আসিয়াছি? যাইবই বা কোথায়? জীবনের
সার্থ্যই বা কি?” এ চিন্তায় অনেক চিন্তা মনে জাগিত। অনেক
স্বপ্ন ও ভ্রমোন্মত্তা বিষয়ের আলোচনা করিতে সাধ যাইত।
আবার অনেক সামান্য বিষয়,—যাহা সংসারের সামান্য লোকেও
জানে, তাহা লইয়া বিস্তর মাথা ঘামাতাম; কিন্তু কোন
মীমাংসা করিতে পারিতাম না। আপন মনে কখন হাসিতাম,
কখন কঁাদিতাম, কখন বা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতাম।
আমার সদাই এই মনে হইত,—“সংসারে যে এত মানুষ রহি-
য়াছে,—সকলেই দেখিতে পাই, আপন আপন অতি তুচ্ছ কাজ
লইয়াই ব্যস্ত। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, এটা সেটা

সাংসারিক কার্য সাধন ও আহারাশেষণ, অথবা বিলাসবিভ্রম-
বিহার করে, না হয় নির্দিষ্ট কোন একটা তুচ্ছ কাজে লিপ্ত হয় ।
তাহাও আবার সেই একটানা, একঘেয়ে সুরে ধরা-বাঁধা । রাত্রেও
আবার এই নিয়মে ছোট ছোট কটা ধরাবাঁধা কাজ । ঠিক যেন
কলের পুতুলটির মত । এইরূপ—আহার, বিহার, নিদ্রা, অর্থো-
পার্জন, আর বংশবৃদ্ধি—এই লইয়াই ত দেখিতেছি, পনের আনা
মনুষ্য-জীবন ! যেন আর কোন কাজ নাই ! জীবনের কোন লক্ষ্য
নাই ! মরিতে আর হইবে না !—যম যেন ভুলিয়া আছে ! এই
ভাবেই সংসারটা চলিতেছে । তাহাও নয় বুঝি যে, কোনরূপ
হ্রাস-বৃদ্ধি আছে,—কাজের এই ধরাবাঁধা নিয়মের পরিবর্তে,
কোনরূপ নূতনত্ব আছে ;—তাহা হইলেও না হয়, মনকে প্রবোধ
দিতাম । এই প্রতিস্থাপকহীন, একটানা, একঘেয়ে, ভারবহ
জীবনে আমার মন বসিত না । আমি সদাই একটা মহা অভাব
অনুভব করিতাম । বাস্তবিক, জীবন আমার একটা মহাশূন্য বোধ
হইত । ভাবিতাম, কেন, মানুষের কি কোন স্বাধীনতা নাই ?”

রোগ বুঝিয়া নিজের ঔষধ নিজেই ব্যবস্থা করিলাম । বাল্য-
কাল হইতেই সঙ্গীতে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল । একটু
একটু কবিতাও লিখিতে পারিতাম । বিদ্যালয়ের পাঠ অল্প
সময়েই সাঙ্গ করিয়া, আমি অনেক সময় কবিতা ও গানে মগ্ন
থাকিতাম । প্রাচীন কাব্য সকল পাঠ করিতাম, কখন বা মনের
ভাব একত্রিত করিয়া ছোট ছোট কবিতা লিখিতাম । এক
লেখা শতবার পড়িতাম । তাহাতে মনে বড় আনন্দ হইত ।
গুন্ গুন্ স্বরে আপন মনে প্রচলিত গান ও অত্যাশ্চর্য প্রচলিত
ধর্মবিষয়ক গান গায়িয়া, অনেকটা শান্তি পাইতাম ।

মনের এই দারুণ ছরবছার সময়, মনে মনে বার বার এই
কবিতাটি আবৃত্তি করিতাম ;—

“বিষম জীবন-ভার সহে না—সহে না আর

একি হয়, দারুণ বন্ধন ।

মর্শ্ব-গ্রস্থি চিড়ে গেল হৃদি পুড়ে থাক্ হ’ল

এ সময় কোথা নারায়ণ ।

দেখা দাও—দেখা দাও শ্রীমুখে হে কথা কও

দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ-রূপে হরি ।

প্রাণ খুলে কই কথা জুড়াই মরম-বাথা

‘রাবণের চিতা’ দূর করি’ !

মুখ-পানে চাই বার অন্ধকার—অন্ধকার

ঘোর হ’তে ঘোরতম হেরি ;

লক্ষ্যলষ্ট দিশেহারা যেন রে পাগলপারা

সে বিষাদে আপনা পাসরি ।

‘সামাল সামাল’ সবে কার মুখ কেবা চাবে

‘এক ভঙ্গ আর ছাই’ হয় ।

মিটেছে সংসার-সাধ টুটেছে বালির বাঁধ

সমাধি-জীবন লও পায় !

অন্ত্যায়ী তুমি হরি, পরীক্ষা না দিতে পারি,

নিজগুণে হে কাঙারি, তার !

গোপিনী-বল্লভ শ্রাম হ’ওনা—হ’ওনা বাম,

দীননাথ, দীনে দয়া কর ।

অগতির তুমি গতি কুল দাও হে শ্রীপতি,

পলে পলে আত্মহতা হ’তে ;

ইহা পূর উত্তলোক যদি যায় দুই লোক

কেন তবে পাঠালে জগতে ?

কেন এ মানব-জগৎ কোটা-কল্প যুগধর্ম—

কর্মক্ষেত্রে অধমে পাঠালে ;

কেন হৃদে প্রেম-প্রীতি কণাংশে এ ভক্তি-স্মৃতি

প্রাণনাশা ভালবাসা দিলে ?

* * *

সংযম বিহনে হরি, ভেসে যায় মন-তরী,

ভয়-বাধা কিছু নাহি মানে ;

একি মোহ, একি তৃষা, প্রাণঘাতী কি দুরাশা,

হৃষীকেশ, রাখ এ তুফানে ।

না চাহি প্রেমের হাসি, প্রিয়জন প্রেমভাষী,

স্বর্গতট চাঁদ-মুখ আর !

বন্ধন ঘুচায়ে হরি, লও মোরে কৃপা করি,—

জীবন-সর্বস্ব উপহার !।” *

কবিতা পাঠে দরবিগলিত ধারে আমার চক্ষে জল পড়িত ।
হায়, দেবতার চরণেও কি, আমার এ মর্শ্বকাতরতা স্থান
পাইল না ?

(৬)

কিন্তু, ভবিষ্যৎ কে খণ্ডন করিবে ? যাহা হইবার, তাহা
হইল । পিসীমার পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই আমি
বিবাহিত হইলাম । বিবাহের পর এলাহাবাদে কলেজের পাঠ
অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম । কিন্তু এইখানে আসিয়া, আমার
জীবনের আর এক বিপর্যয় ঘটিল । ক্রমেই তাহা বর্ণন
করিতেছি ।

* “কুল” হইতে গৃহীত ।

একদিন সন্ধ্যার সময়, যমুনার তীরে, এক শ্বেত প্রস্তরনির্মিত সোণানোপরি বসিয়া আমি সংসারের নশ্বরতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দূরে কে গায়িল,—

“মায়া-সূতোয় জাল বুঁদেছে হৃষ্টিধর-জ্বলে ।”

আমার চমক ভাঙ্গিল। হৃদতন্ত্রীতে কে যেন আঘাত করিল। দেশ কাল সকলই ভুলিয়া, সে সঙ্গীত-সুধায় ডুবিয়া গেলাম। সে সুধাময় স্বর ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি একাগ্রচিত্তে সে সুধা পান করিয়া ধত্ত হইলাম। গায়ক গায়িতে লাগিলেন,—

“মায়া-সূতোয় জাল বুঁদেছে হৃষ্টিধর-জ্বলে ।

জালের ‘সূ’ ধ’বে দাঁড়ায়ে আছে, (সেই) রবির ছেলে ॥

হৃষ্টিধর সে জ্বলে বেটা,

ধ’রে আছে জালের বোঁটা,

ভাল লাগিয়েছে নেটা,—

বড় ফেলেছে কলে ;—

(কেবল) পালিয়ে গেছে রূপ সনাতন,

সেই জালের গেরো খুলে ॥”

গায়ক আমার সম্মুখীন হইলেন। পরিধানে গৈরিক বসন, সর্কাস্ত ভদ্ৰাচ্ছাদিত, হস্তে বীণা। প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি, জ্যোতির্ময় বিশাল চক্ষু, অধরে মৃদু হাসি। আমার সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মন্তক আপনা হইতেই সে মহাপুরুষের চরণে প্রণত হইল। তিনি তখনও গায়িতেছেন,—

“করি মায়া, মহামায়া,

(জাল) প্রসব করেন ভব-জায়া,

বিস্তারি’ মায়া;—

(জাল) রয়েছে ত্রুণাও বুড়ি

এই ভব-নদীর জলে ॥”

অতি কোমলে আরম্ভ করিয়া, সে স্বর কড়ি-মধ্যমে উঠিল। দিক্দিগন্ত তাহাতে প্রতিধ্বনিত হইল। যমুনার কাল জল উছলিয়া উছলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। উপরে চাহিলাম,— দেখিলাম, আকাশের চাঁদের হাসি স্নান হইয়াছে। নক্ষত্রপুঞ্জও বুঝি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। পরম সৌন্দর্য্যাধার সে পবিত্র মূর্তির আবির্ভাবে, নৈশপ্রকৃতির সে অনুপম সৌন্দর্য্যও আমার চক্ষে স্নান বোধ হইল।

গান থামিল। আমি ভক্তিভরে, পুনরায় সে পবিত্র পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। তিনি উদ্ধহস্তে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। মধুরস্বরে কহিলেন, “কি চাও?”

আমি কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। অনিমেষ নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আবার স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, “বৎস! কি ভাবিতেছ? তোমার আশা পূর্ণ হইবে!”

আমি পরম পুলকিতচিত্তে, ভক্তিভরে, পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আবেগভরে কহিলাম, “দেব! আপনার আশীর্বাদ বেন সফল হয়। আজ শুভক্ষণে আপনার দর্শন পাইলাম। আমার কাণে কাণে কে বেন বলিতেছে, ‘এতদিনে তোর কালবিভাবরী প্রভাত হইল!’ দয়াময়, দয়া করিয়া বলিয়া দিন, সংসারের জালা হইতে কিরূপে অব্যাহতি লাভ করি? আমি ধনজন চাহি না, মানসজন্ম চাহি না, ইহলোকের সুখসম্পদও কিছুই প্রার্থনা করি না,—চাই কেবল অন্তরের

তৃপ্তি। অন্তর্যামিন্ ! এ হতভাগোর অন্তর দেখিতেছেন, বলিয়া দিন, কতদিনে আমি সফলমনোরথ হইব ?”

তিনি কিছু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “বৎস, কাত উতলা হইও না। এ উতলার কাজ নহে। ধৈর্য ধর, সংযমী হও। আত্মসংযম বাতীত মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে, মানুষের ভাগ্যে মহামিলনও ঘটে না। এই মহামিলন কি, পরে জানিবে।”

আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে, করুণস্বরে পুনরায় কহিলাম, “দেব, বটন-অঘটন সে ত আপনার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছাময়, পদাশ্রিত শরণাগতকে বঞ্চিত করিবেন না,—এ অধমকে পায়ে ঠেলিবেন না! আজ হইতে আপনি আমার গুরু! আপনার আশীর্বাদে”—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, “গুরু? কে আর গুরু? আমার গুরু শিব, শিবের গুরু রাম! শিব রাম পরস্পর পরস্পরের গুরুশিষ্য। এ সংসারে সকলের গুরু,—সেই গুরুর গুরু—কল্পতরু সেই বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৎস! তুমি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হও!”

আমি ভক্তি-গদগদকণ্ঠে, আবেগভরে কহিলাম, “গুরুদেব! আর অধমকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। আজ হইতে আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম। বলেন ত, সংসারের নিকটও জন্মের-মত বিদায় লইতে প্রস্তুত আছি। এ কারাগারে বন্দী থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই।”

তিনি একটু হাসিলেন। পরে বলিলেন, “বৎস, তুমি যত মহাজন্মে করিতেছ, এ কাজটা তত সহজ-সাধ্য নয়। মায়ার হাত এড়াইতে পারে, এ সংসারে একরূপ ভাগ্যবন্ত লোক করজ্ঞ

আছেন ? মায়ায় জগৎ সৃষ্টি, মায়ায় স্থিতি ও মায়ায় লয়। মায়ায় জীব মায়ায় মুক্ত ; এক মায়া ছাড়িয়া, আর মায়ায় আবদ্ধ হয়। মনে করে, স্বাধীন হইলাম ! মহা ভ্রান্তি ! মায়ায় বাহার অস্থি-মজ্জা-দেহ গঠিত, সে হইবে স্বাধীন ? বাতুলের কথা ! কবি যথার্থই প্রাণের তারে ঘা দিয়া গাহিয়াছেন,—“মায়ায়-স্বতোর জাল বুনেছে সৃষ্টিধর-জ্বলে !”

আমি একটি ক্ষুদ্র নিবাস ফেলিয়া বলিলাম, “তবে কি দেব, এ অধম জনের পরিভ্রাণ নাই ?”

• তিনি কহিলেন, “ও কথা অনেক দূরের। রাত্রি হইয়াছে, আজ গৃহে যাও। কৃষ্ণের সাধনা কর। কৃষ্ণের রূপা ভিন্ন ক্ষু-ভক্তি লাভ হয় না। আর ঐ যে সংসারত্যাগের কথা বলিলে, উহাও একটা নূতন বাতুলতা। সংসার ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ? বন ? সেও ত সংসার-ছাড়া নয়। একমনে—এক প্রাণে কৃষ্ণের সাধনা কর। মাহুষ নিজে কিছু করিতে পারে না, সকলই সেই কৃষ্ণের প্রসাদাৎ !”

এই বলিয়া, তিনি পুনরায় সেই বীণায় বজ্র দিলেন। দিগ্ধগুল কাঁপাইয়া গায়িলেন,—

“সকলই তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তোমার কর্ম কর তুমি মা, লোকে বলে করি আমি।”

ভক্তির প্রস্রবণ ছুটিল, আমি তাহাতে ডুবিলাম ; প্রাণ অপার আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আপনাকে ধন্তজান করিলাম। মনে মনে কহিলাম, “মা জগজ্জমনি ! সকলই তোমারই ইচ্ছা বটে। আমরা কে মা ? তোমার ধন্যপুত্রি বৈতল নয়। মা ! মনে যেন এই ভাবটি বন্ধনুল হইয়া ধার।

গান থামিল। দরবিগলিতধারে আমার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। পুনরায় ভক্তিভরে, সেই মহাপুরুষের পাদপদ্মে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব রহিলাম। মনে আশা, নিরাশা, বৈরাগ্য, ভয়, ভক্তি—একাধারে জাগিয়া উঠিল। একটু আবেগভরে কহিলাম, “গুরুদেব, অধমকে পায়ে ঠেলিবেন না। যদি কখন কৃষ্ণের করুণা পাই, সে আগ্ননারই কৃপায়। কৃণাময়, এখন আর আমি অগ্র দীপ্তর জানি না,—তিনি অনেক দূরে,—এখন আপনিই আমার মূর্ত্তিমান দীপ্তর! প্রভো! আজ আমার জীবন ধন্য হইল, আমিও ধন্য হইলাম।”

তিনি কহিলেন, “রাত্রি অধিক হইয়াছে,—আজ গৃহে যাও। কল্য এমনই সময়, এইখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।”

আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

(৭)

এল-এ পরীক্ষার আর অল্পদিন আছে, এ সময়ে অধিক পরিশ্রম করিয়া পাঠাভ্যাস করা উচিত; কিন্তু আমার জীবন-স্রোত এখন অগ্রদিকে ফিরিল। সাংসারিক সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতি আমার নিকট এখন অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। প্রাণ উদ্দাস হইয়া গেল;—সুতরাং মনসংযম করিয়া আর পাঠাভ্যাসেরত হইতে পারিলাম না। সকল দিন বিদ্যালয়েও উপস্থিত হইতাম না। লেখা-পড়ার আমার উপেক্ষা প্রকাশ

পাইতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যে, পড়া-শুনা একরূপ বন্ধ করিয়া দিলাম। সকাল-সন্ধ্যা সকল সময়েই গুরুদেবের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম। মাতুল মহাশয় এ সকল দেখিলেন। দেখিলেন যে, আমার মনের গতি এখন অত্মদিকে ফিরিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি আমাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশও দিলেন। কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। আমি উত্তরোত্তর তাঁর অবাধ্য হইতে লাগিলাম।

কাজেই, একদিন তিনি আমাকে স্পষ্টই বলিলেন, “প্রবোধ, যদি লেখাপড়া করিতে তোমার আদৌ ইচ্ছা না থাকে, তবে আর এখানে থাকিবার আবশ্যক কি ? তোমার যাহা মনে হয়, কর। কিন্তু আমার এখান হইতে তোমার “অন্ন-জল” উঠিল।”

আমি নীরবে সকল কথা শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে কহিলাম, “ভাল, তাহাই হইবে,—আমি আজই আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আপনি এতদিন আমাকে অন্নদান করিয়াছেন,—লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, সেজন্ত চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব। জ্ঞানকৃত কোন অপরাধ করি নাই ; যদি অজ্ঞানতাবশতঃ কোন দোষ করিয়া থাকি, অবোধ পুরুষজনে ক্ষমা করিবেন।”

প্রাতে: এই ঘটনা হয়, অপরাহ্নে আর এক ঘটনা ঘটিল। অপরাহ্নে আপন মনে নানারূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় এক টেলিগ্রাম পাইলাম। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—“অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। তোমার শ্বশুর মহাশয় ভীষণ বিসৃষ্টিকায় আক্রান্ত, বাঁচিবার আশা নাই। তোমাকে দেখিতে চুক।”

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গুরুদেবের নিকট গেলাম। এলাহা-

বাদের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার একখানি কুটার;—
আমাদের বাসা হইতে এক মাইল পথ ব্যবধান। তৎক্ষণাৎ
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি
বলিলেন, “এখনই তোমার স্বপ্নের মহাশয়কে দেখিতে যাও, অন্য
কথা পরে হইবে।

সেই দিন সন্ধ্যার রেল-গাড়ীতেই আমি এলাহাবাদ ত্যাগ
করিলাম। পরদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে গন্তব্য স্থানে পহুঁছিলাম।

আমাকে দেখিয়াই মায়া কাঁদিয়া উঠিল। আমার স্বশ্র-
ষ্ঠাকুরাণীও আমাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কঁাদিতে লাগিলেন।
কঁাদিতে কঁাদিতে বলিলেন, “বাবা প্রবোধ, আসিয়াছ! আর
কি দেখিতে আসিলে বাবা? সব কুরাইয়াছে! জন্মের-শোধ
আমার সিংখীর সিঁদূর মুছিয়াছে।”

আমি সকলই বুঝিলাম। বুঝিলাম যে, স্বশ্রষ্ঠাকুর মহাশয়
সকলকে ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ খুব কান্না-কাটি
চলিল। আমি নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নীরবে,
শর্তধারে আমার বুক ভাসিয়া বাইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতেই আবার এক দুর্টর্ঘনা;—স্বশ্রষ্ঠাকুরাণীও ঐ
রোগে আক্রান্ত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ‘দ্যাধ দ্যাধ’ পড়িয়া
গেল। চিকিৎসক আসিল, রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে
লাগিল; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। রোগীর সর্ব্বশরীর
হিমাক্ত হইয়া গেল। সেই দিনই রবি-কিরণের অন্তর্ধানের
সহিত স্বশ্রষ্ঠাকুরাণীর আয়ুরবিণ্ড চিরদিনের জন্য অন্তর্মিত
হইল।

অন্তিমকালে, তিনি, মায়া আমাকে আমার হস্তে সঁপিয়া দিয়া

কাতরকণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, আমার মায়াকে দেখিও । আমার যাহা কিছু রহিল, সকলই তোমার । তিনি একা বৈকুণ্ঠে গেছেন ;—তঁার সেবা-শ্রদ্ধার কষ্ট হইতেছে । আমি সেখানে তাঁর পদসেবা করিতে বাইতেছি ।”

তারপর মায়াকে কহিলেন, “মা, আমি চলিলাম । কাদিও না । মানুষের হাতে তোমাকে দিয়া গেলাম । মরিতে আমার কষ্ট নাই ।”

মায়া বিকলকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল । কাদিতে কাদিতে কহিল, “মা, তোমাকে ভুলিয়া, বাবাকে ভুলিয়া, আমি কেমন করিয়া থাকিব ? মাগো ! আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও ।”

পাষণভেদী করুণস্বরে মায়া কাদিতে লাগিল । সে ক্রমশঃ ঋক্ষাকুরাণীর চক্ষেও জলধারা দেখা দিল । কিন্তু তাহা আর গওস্থলে বহিতে পারিল না ;—যেখানকার, সেইখানেই মিশিয়া রহিল ।

সময় বুঝিয়া সূর্য্যদীপ হাসিয়া উঠিল । যেন ছিন্ন মেঘের কোলে ক্ষীণ সৌদামিনীর বিকাশ ! তাহা আভাহীন, প্রভাহীন, শোভাহীন, প্রাণহীন । কিন্তু সে হাসি,—স্নেহের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, পরম করুণাধার, মায়ের সেই ম্লান হাসি, আজ মায়ার বক্ষে, বিযুক্ত শল্যের ন্যায় বিষম বাজিল ।

অশ্রিম-নিঃস্রাব টানিতে টানিতে মা মায়াকে কহিলেন, “ছিঃ মা, অমন কথা মুখে আনিতে নাই । জ্বালোকের পতির বাড়া মহা গুরু আর কেহ নাই । পতিই দেবতা, পতিই ঈশ্বর । পতি-সেবা ভিন্ন, সতী-নারীর আর ধর্ম্ম নাই । সেই পতি তোমার রহিলেন,—আর তুমি বল, ‘কেমন করিয়া থাকিব ?’ ছিঃ মা !

অমন কথা আর মুখে আনিও না, আশীর্বাদ করি মা,—পতির কোলেই যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয় !”

অতঃপর আমাকে কি ইঙ্গিত করিলেন ; আমি তাঁর শিয়রে বসিলাম। অতি অস্পষ্টস্বরে “হরি হরি” বলিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত। তখনই কয়েকজন প্রতিবেশীর সাহায্যে, তাঁহাকে তুলসীতলে আনিলাম। সকলে সম্মুখে “হরি হরি” বলিতে লাগিলাম ;—এদিকেও অমনি, নীরবে নখর-দেহ ত্যাগ করিয়া সতী মাধবী পতির অন্তঃসরণ করিলেন !

বুঝিলাম, মায়ার বুকের একখানি হাড় খসিল !

(৮)

এই ঘটনার কিছু দিন পরে আর এক নূতন দুর্দৈব উপস্থিত হইল। মায়ার পিতা-মাতার অন্তর্ধানের সহিত, আমাকে সংসার-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জন্মাবধি আমার উপর দিয়া অনেক শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে,—এখনও গেল। তজ্জন্ত, আমাকে অধিক অধীর করিতে পারে নাই। তবে একমাত্র অল্প-বয়স্কা পত্নী লইয়া সংসার-বাস, আমার পক্ষে বিষম ভারবহু বোধ হইতে লাগিল। একটি অনেককালের বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল, সে-ই সমস্ত গৃহস্থালী কাজ-কর্ম করিতে লাগিল। আমি বড় বিপদগ্রস্ত হইলাম। স্ত্রীকে লইয়া সর্বদাই মুখোমুখি হইয়া থাকি, আমার পক্ষে বড় অসহ্য হইয়া উঠিল।

একদিন সন্ধ্যার পর, মনটা বড় খারাপ হওয়ায়, আমাদের গ্রামের প্রান্তগামীমা একটি বাগানে বেড়াইতে গেলাম। স্থানটি বড় মনোহর। চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ। তাহাতে অসংখ্য জাতীয় পুষ্প বিকশিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। বসন্তের প্রারম্ভ। মৃদু-মন্দ মলয় হিল্লোল সেকনে শান্তিহারা প্রাণ কতক জুড়াইল। সংসারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, সংসারের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে মনে কহিলাম,—“যাই হোক,এত দিন কতকটা স্বাধীন ছিলাম,—সংসারের জালা কিছুই সঁহিতে হয় নাই,—আর এখন একেবারে পূরা গৃহস্থালী পার্টিয়া বসিতে হইল। হায়, কেন বিবাহ করিলাম! নিজে অসুখী হইলাম,—সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকেও অসুখী করিলাম! বিধিল্পি কে খণ্ডন করিবে?”

ইত্যাকার চিন্তা মনে উদয় হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিলাম; প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কে যেন কাণে কাণে বলিল,—“হতভাগ্য! এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ? ওদিকে পিষাচে যে, তোমার সর্বনাশসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে!”

যেমনই মনে, এ অশুভচিন্তা উদয় হইল, অমনি শ্রীগুরু স্মরণ করিয়া উঠিলাম। স্বরিতপদে বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। গিয়া ঘূহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃৎতন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, অভিমানে, মর্মান্তিক যাতনায়, বিকল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম, “জগদীশ্বর! কি পাপে আমার এ সর্বনাশ করিলে? গুরুদেব! এ বিপদে তুমি কোথায়।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেখিলাম, আমার খন্তরের

বাঁটির খিড়্‌কীর পথে। হুইজন পিশাচ, একটি কণকপদ্ম স্নকু-
মারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। রমণীর
হস্ত-মুখ সমস্ত বাঁধা। আমি চিনিলাম। বুঝিলাম, আমায়ুই কপাল
ভাঙ্গিয়াছে। সে অভাগিনী আর কেহ নহে—হুঃখিনী মায়া!

অকস্মাৎ হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শরীর শতগুণে
বলীয়ান হইল। বিপুল সাহসে, সেই হৃদ্যন্ত দস্যুদ্বয়কে আক্র-
মণ করিলাম। সরোষে কহিলাম, “পিশাচ! তোদের কি
ধর্ম্মের ভয় নাই?—জীবনে মমতা নাই?”

মায়াকে সেই অম্বরবস্ত্রের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করি-
লাম। তাহার সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলাম। মায়া আমাকে
দেখিয়া বাতনা-জড়িত অক্ষুট চাঁৎকার করিয়াই আমার ক্রোড়ে
মূর্ছিত হইয়া পড়িল। এই অবসরে হৃদ্যন্ত পিশাচবর আমাকে
‘আক্রমণ করিল’। একজন আমার মস্তকে লগুড় প্রহার করিতে
উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া
পাপিষ্ঠের হাত ধরিলেন। জলদগন্তার স্বরে কহিলেন, “পিশাচ!
আর এক পদ অগ্রসর হইবি, কি প্রাণ হারাইবি!”

হরি হরি! এ কাহার কণ্ঠস্বর? এ স্বর যে আমার পরিচিত।
আমি চিনিলাম! বড় হুঃসময়ে ভগবান দেখা দিলেন! পতিত-
পাবন গুরুদেব এ সময় কোথা হইতে আসিলেন? তবে কি
আমার কাতর-প্রার্থনা, অন্তর্যামীর সে রাজীবচরণে পঁহুঁছিয়াছে?

গুরুদেব সেই দস্যুদ্বয়কে আবার কহিলেন, “যদি প্রাণের
মমতা থাকে, তবে অবিলম্বে এখান হইতে দূর হ!”

সে ক্লান্তমূর্ত্তি দেখিয়া, সে অসাধারণ বিক্রম অনুভব করিয়া,
পিশাচদ্বয় প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল।

আমি যেন স্বপ্ন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। ভয়, বিস্ময় ও ভক্তিতে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মুখে একটিও কথা বলিবার হইল না। নির্নিমেষ নয়নে সে অপূৰ্ণ মূর্তি দেখিতে লাগিলাম। আমার অপাঙ্গ বহিয়া দরদর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

গুরুদেব কহিলেন, “বৎস! বিস্মিত হইতেছ?—আমি কোথা হইতে কিরূপে হঠাৎ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ভাবিতেছ? সে কথা পরে হইবে। এখন অন্তঃপুরে চল, তোমার পরিচারিকাও বন্ধনাবস্তায় মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া আছে।”

মায়া তখনও আমার ক্রোড়ে মুচ্ছিতা। গুরুদেব ও আমি কোনও রকমে, তাহাকে বাড়ীর মধ্যে আনিলাম। মুখে চোখে জল দিয়া ক্রমে আমি তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। এদিকে গুরুদেবও পরিচারিকার বন্ধন মুক্ত করিয়া, ‘তাহার মুচ্ছা’ ভাঙ্গাইলেন।

অনুসন্ধানে বুঝিলাম, গ্রামের গুণধর জমিদার বাবুর ষড়যন্ত্রে এই পৈশাচিক কাণ্ড ঘটয়াছিল।

(৯)

যথা সময়ে গুরুদেব, একে একে আমার এই উপস্থিত বিপদ-কাহিনী শুনিলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—“বৎস, আমি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি, সন্মুখে তোমার এক পরীক্ষা উপস্থিত। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছ, ইহাতে সুখ হইলাম।

দেখ, সুখ-দুঃখ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে ; অতএব সুখে-দুঃখে
সংযমী হওয়াই প্রকৃত পুরুষের লক্ষণ।”

আমি কিছু অসংযত-চিত্তে কহিলাম, “কিন্তু দেব, কোন্
পাপে, কার অভিযাপে, ভগবান আমার উপর দিয়া এত ঝড়—
এত তুফান বহন করিতেছেন ! জন্মাবধি শোকের সহিত যুদ্ধ
করিয়া, অনিয়া-পুড়িয়া হৃদয় থাক্ হইয়াছে ; মনে মনে ক্ষত-
বিক্ষত হইয়াছি ! তাহার উপর বিনা দোষে, এ হীন দুর্বলের
উপর প্রবলের যথেষ্টাচার ! বিধাতার এ কি বিচিত্র লীলা !”

গুরুদেব একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন, “দেখ, বিধাতার লীলা
বিচিত্রও বটে, আবার একটু ভাবিয়া দেখিলে, নাও বটে। সুখ-
দুঃখ বা সম্পদ বিপদ যে কি, তাহা কি আমরা ঠিক বুঝিতে পারি ?
ফলাফল দেখিয়া ত কার্যের বিচার ! কিন্তু কোন্ ফাজের ফল
কখন ফলিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব, পর-
মুহূর্তের ঘটনার অনভিজ্ঞ,—কার্যের ফলাফল বুঝিবার তাহার
অধিকার কি ? তোমার স্ত্রী অতি সুশীলা ও সত্য-সাক্ষী। এই
সাক্ষীর পুণ্যফলে তোমার ভাল বই মন্দ হইবে না। সাধুর বিপদ
সম্পদেরই কারণ হয়। অধৈর্য্য হইও না। ভগবানের সর্ব-
মঙ্গলো বিশ্বাসবান হও।”

এইরূপ আরও অনেক কথা হইল। গুরুদেব কিছুদিন আমার
আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন ! শুভ দিনে, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে,
তাঁহার নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম। প্রাণ নববলে বলীয়ান
হইল। অন্তরে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

কিন্তু ভগবান আমাকে বেশী দিন দেশবাসী হইতে দিলেন
না। জমিদার-বাবুর অত্যাচার, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অগত্যা, গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, দেশ পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলাম। স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, আমি শুভ-দিনে সপরিবারে এলাহাবাদ গমন করিলাম। এলাহাবাদ আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। সেখানে একটি বাটী ভাড়া লইলাম। গুরুদেব মধ্যো মধ্যো, আমাদের স্ত্রী-পুরুষকে দর্শন দিতেন। আমিও সকাল-সন্ধ্যা তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইয়া, তদীয় চরণ বন্দনাদি করিতাম। ক্রমে ক্রমে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি প্রচুর ধর্মগ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে লাগিলাম। এলাহাবাদের একটি ইস্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। সামান্য আয়ে, সন্তুষ্ট হইতে, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম।

গুরুদেব মানুষ, কি ছদ্মবেশী কোন দেবতা, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার অলৌকিক সাধনা ও অভূতপূর্ব কার্যকলাপ দেখিয়া, আমি অনেক সময় ভীত, চকিত, স্তম্ভিত বিন্মিত, ও মোহিত হইতাম। সাধনাবলে মানুষ কি তবে সত্য সত্যই এত উচ্চসীমায় উপনীত হইতে পারে? হায়, চক্ষের সম্মুখে এই উচ্চ আদর্শ,—হতভাগ্য আমি,—শূকরে কোহিনুর চিনিবে কিরূপে?

অনেক দিন অনেক চেষ্টা করিয়াও, গুরুদেবের কোন পরিচয় পাই নাই। প্রকৃত নাম-ধাম প্রকাশ করিতে, দেখিলাম, তিনি একান্ত নারাজ।

এখন আবার আমি আমার সেই আঁতের আসল ব্যাথাটা বলিব। এক কথা আমি অনেকবার বলিতেছি। বুঝিতেছি, ইহাতে তোমাদের বিরক্তিবোধ হইতেছে। কিন্তু দেখ, ব্যাথার

ব্যথী হইতে হইলে প্রাণে প্রচুর পরিমাণে সমবেদনা থাকা চাই, যথেষ্ট ধৈর্য ও ক্ষমাশীল হওয়ার আবশ্যক করে। আমি বৈশাখনে পুড়িতেছি, অতি বড় শত্রুর গায়েও যেন সে আশ্রয়ের আঁচ না লাগে। তবে হুঁখীর কথা হুঁদও কাণ পাতিয়া শুনিও, তাহাতে পুণ্য আছে। বিশেষ কবির কথাটি সর্বদাই মনে রাখিও,—“দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।”

আমার মনে এই বড় ছুঃখ রহিয়া গিয়াছে, মাঝাকে একদিনের জন্তও সুখী করিতে পারি নাই! আজ সে কথা মনে করিতেও আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কত দিন কত ভক্ত-সেবা করিয়াছি; অভিমানে কত কুখ্যাতি বলিয়াছি;—অভাগিনী একদিনের জন্তও আমাকে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কহে নাই। প্রত্যন্তর করা দুঃখে থাক, ছলছল চক্ষে, মুখখানি কাঁদ-কাঁদ করিয়া ভূমিপানে চাহিয়া থাকিত। এক-একবার সেই করুণ আঁখি দু’টি আমার পানে চাহিত,—আমি সংসার ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু কেমন করিয়া ভালবাসার বস্তুকে ভালবাসিতে হয়; কিরূপ ব্যবহার করিলে ভালবাসা প্রকাশ পায়, তাহা আমি জানি না। ভালবাসার রহস্য বুঝি নাই। স্ত্রী-চরিত্র কি, তাহাও জানি না। না জানিয়াই আজ চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছি।

মায়া, সরলতার প্রতিমূর্তি। সংসারের কুটিলতা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। পরের ছুঃখ দেখিলে, সে, কাঁদিয়া আকুল হয়। ধর্ম্মে বিশ্বাস, গুরুজনে ভক্তি, দেব দ্বিজে শ্রদ্ধা, দীন-অতুর্দেহ দয়া, বালক-বালিকায় স্নেহ, সর্বজীবে সমবেদনা,—মায়াই মর্ম্মে মর্ম্মে নিহিত। সেই সংসার-জ্ঞান-অনভিজ্ঞা,

সরলা, প্রেমময়ী ভাৰ্যা, সংসারে অতি বিরল । কিন্তু হায়, আমি দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি নাই !

মায়া আমাকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিত । বুঝি, ভালবাসিয়া তাহার আশ মিটিত না । তাই আমি ঘুমাইলে, অভাগিনী ধীরে ধীরে আমার পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া, অনিমেষ নয়নে আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিত । বুঝি, আমাকে দেখিয়া, অভাগিনীর দর্শন-পিপাসা মিটিত না । একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া, চক্ষু জল-পূর্ণ হইত ; আর অমনি অজ্ঞাতে, সেই সুকান্তিময় সুকোমল ঈশুহুল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া আমার পাদমূলে জল পড়িত । এক একদিন আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, আর সে দৃশ্য দেখিয়া মনে কত কি ভাবের উদয় হইত ।

ঐকাল্যে, রাত্রে, বাতায়ন-পথ মুক্ত থাকিত ; আমি যতক্ষণ না ঘুমাইতাম, মায়া পাখার বাতাস করিত । ঘুমাইয়া পড়িলেও তাহার বাতাস থামিত না,—পাছে আমি ঘামিয়া পড়ি । এক একদিন আমি জাগরিত হইতাম । দেখিতাম, চন্দ্রালোক গৃহের ভিতর আসিয়াছে ; সেই স্নিগ্ধ কিরণে প্রেমময়ীর সেই চাঁদমুখ-খানি বড় সুন্দর দেখিতাম । হায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়াও এখন সে সৌন্দর্য্যপ্রতিমা দেখিতে পাই না ! এখন মনে হয়,—

“নয়ন অমৃত-রাশি প্রেরসী আমার,

জীবন-জুড়ান-ধন হৃদি-ফুল-হার ।

কি-জানি-কি ঘুম-ঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে,

এ জীবনে বুঝি ওরে ভুলিব না আর !

ভবুও ভুলিতে হ'বে, কি ল'য়ে পরাণ রবে,

কাঁদিয়া চাঁদের পানে চাহি বারেকবার ।”

আবার কখন বা মনে হয়,—

“কি চোকে দেখেছি তারে ।

সদা জাগে সে প্রতিমা কি আলোকে কি আঁধারে ।

ধরি ধরি এই পাই, আর যেন সেথা নাই,

শূন্য প্রাণে শূন্যে চাই, বুক ভাসে শতধারে ।

কখন বা ক্ষোভে, দুঃখে, নিরাশায়, অভিমানে, মনে মনে
গাই,—

“আর নায়া বাড়ি’ও না, আর লোভ দেখা’ও না,

আর ও মোহিনীবেশে ছ’ল না আমায় !”

কিন্তু হায়, আমার জীবন্তে সমাধি হইয়াছে ! অভাগার এ
মর্য়কথা কে শুনিবে ?

(১০)

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাল কাটিয়া গেল। এই দুই
বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। গুরুদেব, মধ্যে
মধ্যে নিরুদ্দেশ হইতেন, কোন সংবাদ পাইতাম না। কোথা
হইতে হঠাৎ এক একদিন আসিয়া দর্শন দিতেন। সংসারাত্মম
ত্যাগের কথা পাড়িলেই তিনি আমাকে বুঝাইতেন। বুঝাইতেন
যে, আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে সংসারাত্মমই সর্বশ্রেষ্ঠ। একাধারে
যোগী ও ভোগী হইবার এমন বিশিষ্ট স্থান আর নাই। আমি
তন্ময়চিত্তে, গুরুপদ ধ্যান করিয়া, তাঁহারই উপদেশমত জীবন-
যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে এক দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। গুরু-
দেব তখন এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গিয়াছেন।

আজ সেই দুঃখের কাহিনী মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে।

এলাহাবাদের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমার বাসা। আমার বাসার পার্শ্বেই একঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুইখানি মাত্র কুটীর ছিল। সেই কুটীর দুইখানিতে স্ত্রী পুত্র লইয়া ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ব্রাহ্মণের সেই কুটীরে আগুন লাগে। তখন সকলে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। হঠাৎ দারুণ চীৎকার-কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মায়াও জাগিয়া উঠিল। উৎসুক চিত্তে জানেলার নিকট গিয়া দেখি, দাউ দাউ করিয়া ব্রাহ্মণের সেই কুটীর জলিতেছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী—স্ত্রীপুরুষ, সত্যে অতি ব্যস্ত-সম্ব্যস্ত হইয়া, ব্যাকুলভরে “ত্রাহি মধুগৃহন” রবে চীৎকার করিতেছেন।

এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়াই অরিতপদে আমরা স্ত্রীপুরুষে তথায় উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সেই আকুলি-ব্যাকুলি ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহাদের একটি অপোগণ্ড শিশু নিদ্রিতাবস্থায় এখনও গৃহমধ্যে আছে। আগুন ধু ধু জলিলেছে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, হা-হতাশ করিতেছেন। আমি আর ক্ষণমূহূর্তও বিলম্ব না করিয়া, সেই প্রজ্বলিত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এই সময়ে সেই দগ্ধগৃহের অন্ধাংশু ভূমিসাৎ হইল। আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া, পতিপ্রাণা মায়াও সেই প্রজ্বলিত গৃহমধ্যে আমার উদ্ধার সাধনার্থ প্রবিষ্ট হইল। আমি অনেক কষ্টে, কোন রকমে, ব্রাহ্মণের শিশুটিকে বক্ষে ধারণ করিলাম; কিন্তু বাহির হইবার পথ পাইলাম না। অন্তরে শ্রীগুরুর পদারবিন্দ স্মরণ করিলাম।

বুঝিলাম, আমার অস্তিমকাল উপস্থিত। কিন্তু—হরি হরি !
একি, এ ঘোর সঙ্কটে কাহার শাস্তিময় হস্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ
করিল ? বহির্দেশ হইতে গৃহের বৃতি ভাঙ্গিয়া, কে আমাকে
উদ্ধার করিলেন ? আমি চিনিলাম,—পতিতপাবন ভগবান
আমার সন্মুখে ! গুরুদেব এ সময়ে কোথা হইতে আসিলেন ?

আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, করুণ-নয়নে, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া
রহিলাম। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “এখন,
এ কৃতজ্ঞতা দেখাইবার সময় নয়। সন্মুখে তোমার মহা পরীক্ষা
উপস্থিত। প্রস্তুত হও। তোমার সহধর্মিণী, এই প্রজলিত গৃহে
অবরুদ্ধা হইয়াছেন। বুদ্ধি, পতিব্রতার জীবন-নংশয়।”

ভয়-বিস্ময়-মোহে “এঁা, সে কি !” বলিয়া আমি চমকিয়া
উঠিলাম। গুরুদেব কিছু না বলিয়া, ব্যস্তমস্ত হইয়া সেই
প্রজলিত গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুমূর্ষুপ্রায়
মায়াকে লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী
তখনও শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ ও হাহাকার করিতে
ছিলেন। তারপর, শিশুকে দগ্ধহীন অক্ষত শরীরে রক্ষা করিতে
পারিয়াছি দেখিয়া, তাঁহারা সাহ্লাদে আমাকে আশীর্বাদ
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন সে আশীর্বাদবাণী আমার কর্ণে
স্থান পাইল না। সন্মুখে যে লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে
আমার বুক কাটিয়া গেল। প্রাণের স্তরে স্তরে শত বৃশ্চিকে
দংশন করিল। বিকলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলাম, “জগ-
দীশ্বর, এ কি করিলে ? গুরুদেব ! কোন্ পাপে, কার অভি-
শাপে, বিনা মেঘে আমার মাথায় বাজ পড়িল ! মায়্যা, মায়্যা !”—
.. মুখ ফুটিয়া সকল কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না,—

যাতনাজড়িত এন্টা বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম।
ক্ষোভে, হুঃখে, আতঙ্কে, মর্মান্তিক যন্ত্রণায়, বালকের স্তম্ভ
কাদিতে লাগিলাম ।

দেখিতে দেখিতে সে প্রজ্বলিত গৃহ ভূমিসাৎ হইল । তাহার
সহিত ব্রাহ্মণেরও যথাসম্ভব তস্মাভূত হইয়া গেল । আর
আমার?—আমার বুকের একখানি হাড় খসিল ! আমার
কাতরতা দেখিয়া, গুরুদেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, “এখন কান্না
রাখ,—অগ্রে মুমূর্ষুকে রক্ষা কর ।”

আমি অধীরভাবে কহিলাম, “দয়াময় ! যাহা করিতে হয়,
আপনি করুন । আমি আর এখন আমাতে নাই । আমার
বুদ্ধিবংশ হইয়াছে । হায়, মায়া আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে,—
আর আমি রহিলাম কেন ?”

বস্তুতঃ, আমি বার-পর-নাই অধীর হইলাম । সরল-হৃদয়
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আমার এ অবস্থা দেখিয়া যে, অত্যন্ত কাতর
ও কুণ্ঠিত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য । তাঁহাদেরই কারণে
মায়া আজ অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে বসিয়াছে ! বুঝিলাম,
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর ক্ষোভের আর সান্না নাই ।

ভক্তবৎসল গুরুদেব, তৎকালোচিত উপায়ে, বিধিমতে
মায়ার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন । ক্ষণপরে মায়ার চৈতন্ত্য
হইল । তখন আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া, অভাগিনীকে গৃহে
লইয়া গেলাম । আমি ব্যাকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে লাগি-
লাম । কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য !—আমি জানিতাম না যে,
আমার সে কাতর প্রার্থনার উপর, অলক্ষ্যে, অদৃষ্ট, নিষ্ঠুর হাসি
হাসিয়াছিল ।

(১১)

ঔরবজাত কত্ৰা অপেক্ষাও অধিক যত্নে, গুরুদেব, নিজহস্তে মায়াকে সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসাদি করিতে লাগিলেন। অরণ্যজাত এক প্রকার গুল্মের রস, মায়ার সর্কাসে মাখাইয়া দিলেন ; ও স্বহস্তে আর-একটুকি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, সেবন করাইতে লাগিলেন।

ঔষধের অদ্ভুত শক্তি অবিলম্বে প্রকাশ পাইল। মায়া অনেকটা সুস্থ হইল। শরীরের দগ্ধ স্থানগুলি একে একে শুকাইয়া আসিল। কেবল বুকের একখানি ঘা আরোগ্য হইল না। সেই ঘাই অভাগিনীর কালস্বরূপ হইল। এই সময়ে মায়ার একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। আমি তাহাতে ভীত হইলাম। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবকে কহিলাম, “দয়াময়, তবে কি মাদ্রা আমাকে কাঁকি দিয়া যাইবে? দেব, মত্যা বলুন,—মায়ার জীবন রক্ষা হইবে কি না।”

‘তিনি কিছুক্ষণ নিকটর রাহিলেন। পরে গম্ভীরভাবে কহিলেন, “জীবন-মরণ ঈশ্বরের হাত। যে দিন মাতৃষের আয়ু ফুরাইবে, স্বয়ং ঈশ্বর আনলেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এক কাজ কর;—বিক্র্যাচলের নিকটে একটি ক্ষুদ্র কাননে, আমার একখানি ক্ষুদ্র কুটার আছে, তোমার সহধর্ম্মীণীকে সেই খানে লইয়া যাও। সে স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। আবহাওয়ার গুণে অনেক উৎকট রোগও বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। অতএব অগ্রে স্থান পরিবর্তন আবশ্যক। বন্দ, ভ্রত উতলা হইও না; সংযমী হও। সম্মুখে তোমার মহা পরীক্ষা

উপস্থিত । সে পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হও । বালকের ত্যায় অতঃপর
অধীর হইলে চলিবে কেন ? ভবিষ্যৎ কে খণ্ডন করিবে ?” .

আমি আর কোন প্রত্যুত্তর করিলাম না,—করিতে সাহসী
হইলাম না । বিনা-বাক্যব্যয়ে, তাঁহার পদানুসরণ করিতে
লাগিলাম ।

পরদিন প্রাতেই আমরা এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিলাম ।
জন্মশোধ মায়াকে তথা হইতে লইয়া গেলাম । বিদ্যাচলে
উপস্থিত হইয়া, গুরুদেবের সেই কুটীরখানিতে অবস্থান করিতে
লাগিলাম । প্রাণান্তপণে মায়াকে দেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগি-
লাম । বুঝি এই অস্তিত্বে, অভাগিনীর জীবনের সেই শেষ
সময়ে, প্রকৃত ভালবাসার আশ্বাদ পাইয়াছিলাম । বুঝি একটু
প্রাণের-বন্ধন অনুভব করিয়াছিলাম ! স্নেহমাখা ছুঁটা সোহাগের
কথা পাড়িয়া, দাবী স্নেহের কল্পনা করিয়া মায়াকে প্রফুল্ল
করিতে চেষ্টা পাইলাম । কখন বা অভাগিনীকে জন্মের মত হারািব
ভাবিয়া, অধীর হইয়া উঠিতাম । আর সেই সময়ে, আমার
অজ্ঞাতে গাওঁগুল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত । সে উত্তপ্ত
অশ্রু, মায়ার পাংশুময় কপোলে পড়িলে, সে শিহরিয়া উঠিত ।
বংশীরবে যেমন হরিণী শিহরিয়া উঠে, সেইরূপ শিহরিয়া উঠিত ।
বুঝি, মনে মনে ভাবিত, সে জন্মের-মত চলিয়া যাইবে বলিয়া,
আমি কাঁদিতেছি । অর্মান সেই কল্পনাময়ী ক্ষণকর্ণে কহিত,
“ছিঃ, তুমি কাঁদিও না ! কাঁদিলে যে আমার অকল্যাণ হয় ।
কখন এ পৃথিবীতে আসিয়াছি, তখন একদিন ত মরিতেই হইবে ।
সেজ্ঞ আমার হৃৎক নাহি । তবে হৃৎক এই, আমি বিনা তপ-
ন্যায় তোমার মত প্রাণের ঠাকুরকে পাইয়াও বেশী দিন হৃদয়-

মনে বসাইতে পারিলাম না। তোমাকে মনে হইলে, বড় আশায়, আমার আবার বাঁচিতে সাধ যায় !”

কথা শুনিয়া আমি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রেম-প্রতিমা সেই করুণ-কণ্ঠে আবার কহিল, “স্বামিন্! কঁাদ কেন? আমার বাড়া জোর-কপাল আর কার্ আছে? পতির পায়ে মাথা রাখিয়া যে রমণী মরিতে পায়, সে ত ভাগ্যবতী! হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতা তুমি,—হৃদয় আলো ক’রে দাঁড়াও আমার সম্মুখে,—আমি প্রাণ ভ’রে তোমায় দেখি! প্রাণেশ্বর! ত্রোমায় যত দেখি, ততই আমার দশন-পিপাসা বাড়িয়া উঠে!”

এইরূপে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত হইল। রোগ, কখনও অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কখন বা কিছু হ্রাস পায়। গুরুদেব, সপ্তাহকাল পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন। প্রস্থানকালে আমাকে উপদেশ দিয়া গেলেন, “বৎস, অধৈর্য্য হইও না। সর্ব-মান্বল্যে বিশ্বাসী হও। ষাহা হইবার, তাহা হইবে,—তজ্জন্ত মনের শান্তি হারাইও না। আমি এখন কিছুদিনের জন্ত স্থানান্তরে চলিলাম। কার্য্যকালে আমার দশন পাইবে। তোমার শুভ প্রারন্ধকাল আগতপ্রায়।”

গুরুদেব প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশ্বাসবাক্যে আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না। মন যার-পর-নাই উতলা হইল। মায়াাকে জন্মেরমত হারাইব ভাবিয়া, আমি অগ্রে গুমরিয়া কঁাদিতে লাগিলাম। শতধারে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

‘দেখিতে দেখিতে রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল।’ মায়াার

প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। আমি পাবাণে বুক বাঁধিলাম।—
বাঁধিলাম ?—না, বাঁধিয়াছি মনে করিলাম ?

সুবর্ণদীপ হাসিয়া উঠিল। বুঝিলাম, আজ দীপ নির্যাস
হইবে।—বুঝিলাম, আমার সোণার-তরী আজ ডুবিবে! মায়া
প্রলাপ কহিতে লাগিল,—“ঐ দেখ, মা আমার রাজরাজেশ্বরী-
বেশে, সোণার সিংহাসনে, বাবার বামে বসিয়া স্বর্ণ হইতে
নামিত্তেছেন!—এই যে আমারই কাছে আসিতেছেন! মা,
মা, আমাকে কি লইয়া যাইবে? তবে চ’ল মা, যাই!—
বেলা গেল!”

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না;—উদ্ভ্রান্তভাবে,
বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম,—“প্রাণাধিকে, তুমি কোথায়
যাইবে!”

সুবর্ণদীপ আবার হাসিয়া উঠিল। এবার অতি ক্ষীণকণ্ঠে
মায়া কহিল, “প্রাণেশ্বর! কীদ কেন? তোমাকে ছাড়িয়া আমি
কোথা যাইব? তোমায় আমার ত ভিন্ন হইবার কথা নয়।
দৈহিক সম্বন্ধ ঘুচিবে বটে, কিন্তু এই দেহের ভিতরে যে প্রাণ
আছে, আমি সেই প্রাণ লইয়া অহর্নিশ তোমার কাছে কাছে
থাকিব! তুমি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে চাহিবে, আমার
দেখিতে পাইবে! তোমার কৃপায় আমি এ তত্ত্ব বুঝিয়াছি।
প্রভু, আজ কেন আত্মবিস্মৃত হইতেছ?”

মূর্ত্তিমতী বীণাপাণীর ত্রায় নিখিল-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া
মায়া আমাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবিনশ্বরত্ব বুঝাইল।
বুঝিলাম, গুরুদেবের শিক্ষাদান নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তখন
আমি শোকে মুহমান,—এ তত্ত্ব-কথা আমার ‘বুকে’ বিদ্ধ

হইল না। আমি অধীরভাবে আবার চাৎকার করিয়া কঁাদিতে কঁাদিতে কহিলাম, “গৃহলক্ষ্মী আমার! আমাকে ফাঁকি দিয়া, কোথা যাইতেছ?”

মায়া অস্তিম-নিশ্বাস টানিতে টানিতে আরও ক্ষীণকণ্ঠে, আরও অস্পষ্টভাবে কহিল, “প্রাণেশ্বর! মা-আমার সতী সাক্ষী,—আজ সেই সতীর আশীর্বাদ সার্থক হইল! মা-আমার বলিয়াছিলেন,—‘যেন পতির কোলেই তোমার আয়ু শেষ হয়।’ আঃ! আজ আমি সুখে মরিতে পারিবা। প্রাণেশ্বর! আশীর্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম তোমাকেই স্বামী পাই।”

প্রেমময়া আনাকে কি ইঙ্গিত করিলেন। আমি বুঝিলাম। ধীরে ধীরে সাক্ষীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কম্পিতহস্তে, ধীরে ধীরে আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, মায়া, আপন মস্তকে ও জিহ্বায় স্পর্শ করিল। আমি চিত্তার্পিত স্থিরনেত্রে সতী-প্রতিমার সেই শেষদৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সতীর চক্ষু কপালে উঠিল; সে সময় আমার চক্ষুও বিকারিত এবং পলকহীন হইল। জন্মের শোধ সেই চারিচক্ষে মিলন হইল। সে চারিটিই ডাগর চক্ষু। যেমনই আমার চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া, কয় ফোঁটা গরম রক্ত পড়িল,—হরি! হরি! হরি! অমনি আর একজনও অনন্তকালের জ্ঞান হুই চক্ষু মুদ্রিত করিল! ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও সে চক্ষু আর খুলিবে না!

বহুক্ষণ ধরিয়া সেই শবদেহে পড়িয়া বিহ্বলচিত্তে কঁাদিতে লাগিলাম। শেষে ব্যাকুলভরে ইষ্টদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলাম, “দয়াময়! এ বিপদে কোথা তুমি?”

অতঃপর যাহা যাহা ঘটয়াছে, তাহা আমি গ্রন্থের প্রারম্ভেই

বলিয়াছি। সেই সোণার প্রতিমা শ্মশানে লইয়া গিয়া,
যথাবিধি-সংকার করিয়া, ভাঙ্গা বৃকে গঙ্গা তটে বসিয়া আছি,
এমন সময়ে দূরে গুরুদেবের সেই প্রাণারাম সঙ্গীত শুভ্রিতে
পাইলাম। দুঃসময়ে পতিতপাবনকে দেখিয়া আমার মনোভাব
যে রূপ হইয়াছিল এবং সে সময়ে তিনি আমাকে যে সব উপ-
দেশ দিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছি। এইবার আমার
জীবনের সেই “মহামিলনের” কথা বলিয়া, এই ক্ষুদ্র দুঃখকাহি-
নার পরিসমাপ্তি করিব।

(১২)

গুরুদেব আমাকে স্বদেশ যাত্রা করিতে অনুমতি দিয়া
কহিলেন, “ঠিক আর এক বৎসর পরে ঐ শ্মশানে—যেখানে
তোমার নবজীবন লাভ হইয়াছে—সেই মহাস্থানে, আমার
সাক্ষাৎ পাইবে। ঐ স্থানে তোমার আমার মহামিলন হইবে

তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, পদব্রজে নানাস্থান
ভ্রমিয়া, বহুদিন পরে জননী-জন্মভূমি দর্শন করিলাম। প্রথম
প্রথম মায়ার শোক বৃকে বড়ই বাজিতে লাগিল। কোন কার্য্যেই
মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। অহর্নিশ সেই ধ্যানে—
সেই জ্ঞানে জীবন অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু পতিতপাবনের
করুণাগুণে আমার চৈতন্যলাভ হইল। বুঝিলাম, সকলই আসক্তি
ও মায়ার খেলা বটে! যাহাই হউক, এই আসক্তি ও মৃগ্যাবলেই
কালে আমি সেই জগজ্জননী মহামায়াকে দর্শন করিলাম!
দেখিলাম, সংসারের সর্ব্বত্রই সেই মহামায়া! আমার প্রাণাধিকা,

জীবনসর্বস্ব, প্রেমময়ী, প্রিয়তমার স্মৃতি হইতেই ত আমার নবজীবন লাভ হইল! শত্রু মিত্র, সুন্দর কুংসিত, সং অসং, পুণ্যদান্ পাপী—সকলকেই এখন আমি এক চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। সকলকেই আপনার জ্ঞান হইল;—‘পর’ বলিয়া সংসারে আর কেহই রহিল না। জীবন ধন্ত হইল। মন অপার আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আপনার ক্ষুদ্র আমিষ হারা-ইয়া, এ অথও ব্রহ্মাণ্ড ‘আমিময়’ দেখিতে লাগিলাম। সর্বভূতেই প্রিয়তমার সেই পবিত্র স্মৃতি উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।

“দেখে আসিয়া পরিচিত অপরিচিত সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার চিত্তের সাধুতা দেখিয়া, সকলে আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। নির্দিষ্ট দিনে আমি আবার বিদ্যাচলে পহঁছিলাম।

* * * * *

কিন্তু একি!—একদিন গভীর নিশীথে, সেই শ্মশানপার্শ্বস্থ স্মৃতিস্তম্ভ সৈকতে বসিয়া আপন মনে গান করিতেছি, এমন সময় তিক মাথার মত একটি প্রেমময়ী মূর্তি, এলোকেশে—মোহিনী বেশে, ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দৃশ্য দেখিয়া আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে সে মূর্তিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলাম। মূর্তি সরিয়া গেল।

কিন্তু এবার দেখি,—হরি হরি! একি দেখি! আ-হা হা, কি অপূর্ণ রূপ! প্রাণ ভরে গেল! দশ দিক আগো ক’রে কে এলি মা! মা, মা! এত দিনে কি তোর অকৃতী সন্তানকে মনে পড়িল মা? গুরুদেব! দীননাথ! এ শুভদিনে কোথা

তুমি ? পতিতপাবন, দেখে যাও প্রভো, জগজ্জননী আমার কোল দিয়াছেন !

অকস্মাৎ সে স্থান আর এক জ্যোতির্ময় আলোকে আলোকিত হইল। শিবানী ধীরে ধীরে স্থানে চলিলেন। ঠিক সেইখানে—যেখানে এক বৎসর পূর্বে আমার জীবন-প্রতিমা পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই চিরস্মরণীয় পুত্ৰ স্থানে জগজ্জননী শ্রামানুভিতে দিক্ আলো করিয়া দাঁড়াইলেন ! আমি মন্ত্রমুগ্ধের স্থায় কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুদেবও ঠিক সেই সময়ে, সেই সোমানুভিতে, বীণায় ঝঙ্কার দিয়া গায়িতে গায়িতে, অকস্মাৎ তথায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বর্গ-মর্ত্ত তখন এক হইয়া গেল ! গুরুদেব গায়িতে লাগিলেন,—

“যশোদা নাচাত কোলে (ওমা) ব'লে নীলমণি।

সে রূপ লুকা'লি কোথা, করালবদনি ! (শ্রাম)।”

হরি হরি ! দেখিতে দেখিতে চকিতের স্থায়, মায়ের সে মোহিনী-মূর্ত্তি আবার ব্রজের সেই সাধের গোপাল-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মরি মরি, কি অপরূপ রূপ ! ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-বেশে নটবর শ্রাম, মোহন-মালা গলায় দিয়া, আর সেই মোহন-মুরলী মোহন করে লইয়া “রাধে রাধে” বলিয়া বাজাইতেছেন ! সেই মোহন বাণীর প্রতি রক্ত হইতে বাহির হইতেছে,—“জয় রাধে, স্ত্রীরাধে !” আহা, কি অপূৰ্ণ সুর ! প্রাণ ভ'রে গেল ! দয়াময়, আবার বাজাও—“রাধে, রাধে, রাধে !”

এ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া, আমার অপাঙ্গ বহিয়া, দরদর ধারে, আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি নির্নিমেষ নয়নে সেই অলৌকিক দেব-লীলা দেখিতে লাগিলাম।

• এইবার গুরুদেব পরম প্রীতিভরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “বৎস, বলিয়াছিলাম না, ঠিক আর এক বৎসর পরে, এই স্থানে তোমার-আমার মহামিলন হইবে! আজ সেই মহামিলন হইল! আল! তুমি নবজীবন লাভ করিলে!”

অতঃপর, আবার সেই বীণায় স্বাকার দিয়া, গুরুদেব, শ্রীজয়-দেবের সেই স্বধার-সমুদ্র মধুন করিলেন,—

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল

কলিত ললিত বনমালা । জয় জয়, দেব হরে ।

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবধ্বজ

মুনিজনমানসহংস । জয় জয়, দেব হরে ।

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন

যদুকুলনতিনিনেশ । জয় জয়, দেব হরে ।

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন

সুরকুলকেলিনিধান । জয় জয়, দেব হরে ।

অমলকমলদললোচন ভবমোচন

ত্রিভুবনভবননিধান । জয় জয়, দেব হরে ।

জনকহত্যাকৃতভূষণ জিতদূষণ

শমরশমিতদশকণ্ঠ । জয় জয়, দেব হরে ।

অভিনবজলধরহৃন্দর ধৃতমন্দর

ত্রীমুখচন্দ্রচকোর । জয় জয়, দেব হরে ।

* * * * *

আমি কোথায় ? এই কি সেই ত্রিবৈকুণ্ঠধাম ?—যেখানে
ভক্তবৃন্দ অহর্নিশ সেই পরা-ভক্তি-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন ? এই

কি সেই গোলকবিহারী, গোপিকনবল্লভ,—বৈষ্ণবের সৰ্বস্বধন ?
 আর এই কি আমার সেই জীবনের পথ-প্রদর্শক, সংসার-সমুদ্রে
 ধ্রুবতারা শ্রীগুরুদেব ?—বাঁহার করুণাবলে ইহ সংসারেই স্বর্গ-
 লাভ হয় ?

হরি হরি ! ! কোথা আমি ? একি স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, না মায়া ?

সমাপ্ত ।





লীলা ।

(১)

বিষগ্রামে একদিন কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া শিবমন্দিরে যাইতেছিল। গ্রীষ্মকাল, সময়—মধ্যাহ্ন। সূর্য্যের প্রথর রশ্মিমালায় চারিদিক ঝলসিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একবার একটু বাতাস বহিতেছে, যেন মালসাথানেক আগুন কে গায়ে ঢালিয়া দিল বোধ হইতেছে। “রবির তাপে চাঁদনী ফাটে”—তাও বরং নয়,—কিন্তু সেই পথের ধূলি-বালির জ্বালা সহ করা বড় শক্ত কথা! উপরওয়াল মনিবের মুখ-ভারি সহ করা যায়, কিন্তু তাঁর সেই পোষা-বিড়াল—নন্দহুলাল—খাস মো-সাহেব বাবুর ক্রকুটী ভক্তি একান্ত অসহ্য।

এই দুপুর রোদে, কিম্ কিম্ সময়ে, পশু পক্ষীও তৃষ্ণায় “টা টা” করিয়া যে যার “আস্তানায়” অবস্থিত; কিন্তু মেয়ে-মাস্তুলগুলো বেন কি!—ঐ সারি গাথিয়া প্রোটা, বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা—একদল চলিতেছে। সেই অগ্নিময় ধূলি-বালি, কাঁটা-খোঁচার মত পায়ে ফুটিতেছে, সে দিকে বড়-একটা ক্রক্ষেপ নাই,—হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। মাথায় এক এক খানা গামছা;—বাড়ী হইতে আর্দ্রাবস্থায় আনা হইয়াছিল বটে; কিন্তু এইটুকু আসিতেই তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। একটু বালিকা, পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া তাহার মাতামহীকে কহিল,

“দিদি-মা, আর কতদূর ? আমি যে আর হাঁটতে পারি না।
দিদি-মা !”

দিদি-মা কহিল, “ঐ বাবার মন্দির দেখা যাচ্ছে । এস
দিদি,—তুমি আমার কোলে এস ।”

মাতামহী, দোহিত্রীটিকে কোলে লইয়া মুখচুষন করিলেন ।
কহিলেন, “তুমি যে দিদি বায়না নিলে, হেঁটে যাবে ! আগে
কোলে উঠতে চাওনি, কেন ভাই ?”

মনে মনে কহিলেন, “আহা হুঃখিনী রে ! তোদের
দ্বাবনার আমিও ম’লেম ।”

বর্ষায়সী বিধবা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিলেন । কিন্তু তখনই
আবার সেই কুসুম-কম দোহিত্রীটির চাঁদমুখে ছুটা চুমা খাইলেন ।

আর বাকী দ্বীলোকগুলি এ-কথা সে-কথা কহিতে কহিতে
গন্তব্য-স্থানে উপনীত হইল ।

(২)

এই গ্রামে খুব বড় একটি দীঘি আছে । দীঘির জল বড়
ভাল,—নির্মল, স্নিগ্ধ, ঢল-ঢল । জলে মুখ দিলে, মুখ দেখা
যায় । গ্রামের সকলেই এই দীঘির জল ব্যবহার করিয়া
থাকে । দীঘির তীরে সারি সারি অনেক নারিকেল, সুপারি,
বকুল ও আম্র-বৃক্ষ । তাহার শীতল ছায়ায় আতপতাপক্লিষ্ট
গো ও গো-পালকগণ বিশ্রামলাভ করিতেছে । অদূরেই একটি
শ্রামল মাঠ দৃষ্টিগোচর হইতেছে ।

দীঘির পরপারেই একটি শিব-মন্দির । মন্দিরটি অনেক
দিনের পুরাতন,—ভগ্নপ্রায় । মন্দিরের গায়ে শেওলা ও

অীরণ্যলতা আশ্রয় লইয়াছে; দুই এক স্থান ফাটিয়া-চটিয়া হাঁ হইয়া গিয়াছে, একটু-আধটু ভাঙ্গিয়া খসিয়াও পড়িতেছে। দুই প্রান্তে বহুকালের দুইটি অশ্বখ ও বটবৃক্ষ। প্রকাণ্ড বিটপী-দ্বয় বহু শাখা-প্রশাখায় পরস্পর জড়িত হইয়া আছে। মন্দিরটি যেন তাঁহাদের সঙ্গে সাথী। ভূমি হইতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া অসংখ্য শিকড় মন্দিরের চারি দিকে আশ্রয় লইয়াছে। সেই সকল শিকড় গজাইয়া এবং মূল শাখা হইতে ‘নামনা’ বাহির হইয়া, আবার অসংখ্য ‘বংশধর’ উৎপত্তি হইতেছে। তাহারাও স্বতন্ত্র এক একটি অশ্বখ-বট! ফল কথা, মন্দিরটি না লইয়া আর ইহারা এখান হইতে নড়িতেছেন না।

“অশ্বখ-বটের স্নিগ্ধ ও ঘন ছায়ার মাঝে এই শিব মন্দির। স্থানটি বড় মনোরম, সুখ-শান্তিময় ও প্রীতিপ্রদ,—বিশেষতঃ এই শুভট গ্রীষ্মের দিনে। জ্বালোকগুলি এখানে আসিয়া যেন ধড়ে প্রাণ পাইল। “আঃ! বাচলুম বাবা” বলিয়া কেহ বসিয়া পড়িল, কেহ শুইয়া পড়িল, কেহ কেহ বা ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম-চ্ছলে, কিছুক্ষণের জন্ত দম ফেলিয়া বাঁচিল। মন্দিরের পুরুত-ঠাকুর, একত্রে অনেকগুলি জ্বালোক দেখিয়া তাঁরহু’পরমা আয়ের সংস্থান বুঝিয়া, সাগ্রহে, “এস মায়েরা এস” বালিয়া সেই বৃক্ষতলে একটা মাহুর বিছাইয়া দিলেন। ব্যস্তবাগীশ হইয়া তখনই এক কলসী স্নিগ্ধ জল ও একটা বড় লোটা হাজির করিলেন। একথা সে-কথায় আপ্যায়িত করিয়া পরে কহিলেন, “তা’ মা-ঠাকুরগরা, বাবার মন্দিরে এসেছেন, বাবাকে দেখে যান।”

একজন প্রণীয়া কহিল, “হাঁ, অবিশ্বি। এখানে এলুম, আর বাবাকে দেখে যাব না?”

পুরুত-ঠাকুর মাথা নাড়িয়া “তা ত বটেই—তা ত বটেই” করিতে লাগিলেন । এমন সময় একজন যুবতী সেই প্রবীণাকে কহিল, “তা রাঙা দিদি, তুনি বল না, বাবাকে ত দেখেই, কিন্তু আগে আমরা সেই সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে দেখতে ইচ্ছা করি।”

কথাটা অবশ্যই পুরুত-ঠাকুরের কর্ণগোচর হইল । তিনি মন্তক-কণ্ঠ্যন করিতে লাগিলেন । বৃষ্টি মনে মনে এই ভাবিতে লাগিলেন, “তবেই ত দেখছি, আমার দফা রফা ! সন্ন্যাসী বাবাজীকে দিয়ে-থুয়ে যে আমার জন্তে কিছু থাকে, এমন ত বোধ হয় না । এখন বুঝছি, বাবাজীকে ‘আস্থানা’ না দেওয়াই ছিল ভাল।”

প্রকাশে কহিলেন, “তা আস্থন না আপনারা, সন্ন্যাসী বাবাজী ওখানে চুলি জেলে ব’সে জপ কচ্ছেন।”

বস্তুতঃ, মন্দিরের পশ্চাৎভাগে একটু স্থান অধিকার করিয়া জনৈক সন্ন্যাসী বিরাজ করিতেছেন । পরিধানে কোঁপিন বাসু, দেহ ভস্মাচ্ছাদিত, মন্তকে জটাজুট লম্ববান । সম্মুখে একটি অগ্নিকুণ্ড জালিয়া, বাবাজী ক্রিয়ায় নিযুক্ত ।

সপ্তাহকাল হইল, সন্ন্যাসী এখানে আসিয়াছেন । পাড়া-গায়ে একজন সন্ন্যাসী-মহাস্ত উপস্থিত হইলেই জনতা হয় । বিশেষ, যদি সেই মহাপুরুষের একটু-আধটু গণনা-শক্তি বা ‘শিকড়-মাকড়ের’ ক্ষমতা, থাকে, তবে ত অতি অল্পকালের মধ্যেই তার পসার, জমিয়া যায় । এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল । সন্ন্যাসী বাবাজী ঠিকঠাক ভাগ্য-ফল গণনা করিতে পারেন শুনিয়া, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন । বাবাজীও

বুজুক্কি চালাইতে ছাড়িলেন না ;—কাহারও ধনোপার্জনের পথ, কাহারও নষ্টধন উদ্ধারের উপায়, কোন রমণীর মৃতবৎসার ঔষধ, কাহাকেও বা বশীকরণ মন্ত্র,—এইরূপ হরেকরকমের বুজুক্কি দেখাইয়া তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই বিলুপ্তগ্রামে আপন পসার জমাইয়া বসিলেন । ভদ্রমহিলাগণের মধ্যাহ্নকাল ব্যতীত অন্য সময়ে বড় একটা সুবিধা ঘটিয়া উঠে না,—তাই তাহারা আহাৰাদির পর সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন । আজও এই একদল আসিয়া যুটিলেন ।

(৩)

ঈলোকগণ সন্ন্যাসীর সম্মুখবর্তিনী হইয়া, ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন । বাবাজীও কি একটা হিন্দিবাৎ আওড়াইয়া আশীর্বাদ করিলেন । তারপর, যথাসময়ে, একে একে সকল ঈলোকের হাত দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন । বলা বাহুল্য, চতুর বাবাজী, সকলেরই মনের মত কথা বলিতে লাগিলেন । কথা, আধা হিন্দী ও আধা বাঙ্গলাতেই চলিতে লাগিল । সন্ন্যাসীর মুখে ‘রা’ শব্দ ফুটিতে-না-ফুটিতে, ঈলোক দল, “হ্যাঁ গা বাবা, হ্যাঁ,—তাই বটে” বলিতে থাকে, আর বাবাজীর গণনাও তাহাতে বেশ জমিয়া যায় ;—নানারূপ সংস্কৃত ও হিন্দী শ্লোক—মাথায়ুও আওড়াইয়া বাবাজী প্রতিপন্ন করেন, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অশ্রান্ত—বেদবাক্য ।

হাত-দেখা শেষ হইলে পর, সন্ন্যাসী বাবাজীর ঔষধ বিতরণের পালাও শেষ হইল । তখন সকলে প্রার্থিত-বস্ত্র-লাভাশায়

সন্তুষ্ট হইয়া, বাবাজীকে কিছু কিছু প্রণামী দিল। বাবাজীও “শিব শিব” বলিয়া তাহা থলিতে পুরিলেন।

পুরুষ-ঠাকুর মহাশয় তখন বাবাজীর জন্ত সিঁদুর আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বাবাজীর কথা আধা হিন্দী, আধা বাঙ্গলা ;—আমরা কিন্তু তাঁর কথা খাঁচী বাঙ্গলাতেই বলিব ;—তাহাতে লেখক-পাঠক হুঁয়েরই সুবিধা।

যে প্রবীণাটি সেই ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া আঁসিয়া ছিলেন, তিনি এক্ষণ অবধি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, “মা জি! সকলে হাত দেখালেন, তুমি চুপ করে রইলে যে? আর ঐ মেয়েটির হাতও যে দেখালে না?”

প্রবীণা একটি নিখাস ফেলিয়া কহিলেন, “হাঁ, এখানে এসেছি যখন, দেখাব বৈ কি!”

পরে দোহিত্রীটিকে কহিলেন, “দেখাও ত ভাই লীলা;—তোমার হাতখানা। সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে নমস্কার কর।”

বালিকা, ডাগর চক্ষু হুঁটি মেলিয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া রহিল; সন্ন্যাসীও একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনী রমণীগণ অমনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, “আহা, এ মেয়েটি বড় অনাধিনী,—জন্ম-ভুঁখিনী! যখন লীলা মায়ের পেটে, তখন ওর বাপ বিবাগী হ’য়ে কোথায় চ’লে যায়। আজ ৬৭ বছর হলো, কোন উদ্দেশ্য নাই। মা ওর কেঁদে কেঁদে মরার-মত হ’য়ে আছে। পোড়া কপালী কাকেও মুখ দেখায় না।, আপনার হুঁখে আপনি গুম্বরে মরছে।”

ইত্যাকার দীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদিয়া তাঁহারা লীলার মার হুখে একেবারে গলিয়া গেলেন। কিন্তু এর আগে কেউ একবারটিও সে কথা উচ্চ-বাচ্য করেন নাই। যে যার আপন আপন হাত দেখাইতেই ব্যস্ত ছিলেন। লীলার মাতামহী কিন্তু কণ্ঠার চরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া এবং উপস্থিত পাঁচজনের মুখে জামাতার নিকুদ্ধেশের কথা বলিতে শুনিয়া, একটু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

(৪)

এই সময়ে, অকস্মাৎ আর এক সন্ন্যাসী সেইখানে উপস্থিত হইলেন। পরিধানে গৈরিক বসন, দেহ বিভূতিপরিলেপিত, শিরে জটাভূট পরিবাপ্ত। আকৃতি গম্ভীর অথচ প্রশান্ত; মুখমণ্ডলও প্রফুল্ল, কিন্তু ললাটদেশে ঈষৎ চিন্তারেখা বিশিষ্ট। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবৎ, দেহ বলিষ্ঠ, বয়স প্রায় চল্লিশ। নবাগত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়োৎকর্ষ লোচনে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ বা ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী, তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন, “আপনারা আমাকে প্রণাম করিবেন না;—প্রণাম করিলে আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটবে।”

পরে মহাস্ত-বাবাজীকে কহিলেন, “মার্কণ্ড! এই বুঝি তোমার শিব-পূজা হ’চ্ছে?”

কথাটা, মার্কণ্ড বাবাজীর মনঃপূত হইল না,—তাই তিনি মনে মনে ঈ-একটু ইংরাজী আওড়াইলেন।

নবাগত সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোকগণকে কহিলেন, “আপনাদের কাজ হ’য়ে গেছে, এখন বাড়ী যেতে পারেন।”

অনেক প্রবীণা কহিলেন, “হাঁ, আমাদের হাত-দেখান হ’য়ে গেছে বটে, তবে এই মেয়েটির বিষয়ে, এর দিদৌ-মা কিছু জানতে চান।”

“তা বৈশ;—আমিই এই মেয়েটির হাত দেখুচি। কিন্তু আর কেউ কাছে থাকলে কিছু বলতে পারব না; আর ব’লেও সব কথা ফলবে না!”

“তা আমরা নয় বাচ্চি। আপনি দয়া ক’রে ব’লে দিন,— এর বাপ এখন কোথায়, আর কি হালে আছে? আহা, সোয়ানীর ভাবনায় এর মা হতভাগিনী, আজ ক’ বছর অধিক মরার-মত হ’য়ে প’ড়ে আছে!”

সন্ন্যাসী একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন, “আমার যথাসাধ্য গণনা ক’রে দেখি, যা হয় পরে শুন্তে পাবেন; কিন্তু এখন আপনারা আসুন, কেবল এই মেয়েটি থাক্।”

এ কথায় পাঁচজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। রামের-মা কহিল, “তা হোগ ব্যানে সন্ন্যাসী,—তা’ বলে মেয়েটাকে ফেলে রেখে যেও না! কে, কোন্ ছলে, কি কর্তে এসেছে, তার ঠিক কি?”

বিচক্ষণ রামের-মার কথাটা সকলের মনে ধরিল। সকলেই একমত হইল। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, অগ্রে ইহাদের সংশয় দূর না করিলে, অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। তিনি কহিলেন, “আপনাদের পুরুত-ঠাকুর ত এখানে রহিলেন, এ’র সঙ্গে এখনই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছা করেন ত, আপনারাও থাকতে পারেন, কিন্তু তাতে গণনাটি না মিলতেও পারে।”

এ কথায় অগত্যা আবার সেই বিচক্ষণ রামের-মা উপদেশ দিলেন, “তাও বটে। তবে লীলা থাকে থাক্। পুরুত-ঠাকুর ত, আমাদের আর পর নন। আর আমাদের ঘর-বাড়ীও ত ঐ দেখা যাচ্ছে। ভাল, দেখাই থাক না,—ইনি ঙ্গে কি বলেন ? কি বল গো, শাস্তর-মা ?”

কিন্তু শাস্তর-মার দৃষ্টি তখন সেই সন্ন্যাসীর উপরেই ন্যস্ত ছিল,—এ সকল কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিয়াছে কি না, সন্দেহ। অনিমেঘ নয়নে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া আছেন, ও মনে মনে কি ভাবিতেছেন। তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল ; কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি একটি কথাও কহিতে পারিলেন না।

“বলিতে হইবে না যে, লীলার মার নাম শাস্ত।

রামের-মা এবার সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে, তিনি শুনিলেন। স্মরণঃ রামের মার কথাই সাবাস্ত হইল। অতঃপর সকলে শিব-প্রণামাদি করিয়া, পুরুতঠাকুরকে বলিয়া গেলেন যে, লীলা, সন্ন্যাসীর কাছে রহিল, হাত-দেখা হইয়া গেলে, পুরুত-ঠাকুরই লীলাকে বাড়ী পঁছিয়া দিবেম।

পুরুত-ঠাকুর ছ’পরসা পাইয়াছেন, স্মরণঃ খুসী আছেন। তিনি মাথা নাড়িতে নাড়িতে সাহ্লাদে কহিলেন, “তা, এ কাজটা আর পারব না ? তবে আর আপনাদের ‘আপনার জন’ কি ? তা’ মায়েরা মাঝে মাঝে বাবার মন্দিরে আস্বেন। এখানে এলেও পুণ্য আছে ;—এমন কত সাধু-সন্ন্যাসী নিত্য বাবাকে দেখতে আসেন।”

স্বীলোকদল সারি গাঁথিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে গৃহ-ভিত্তিতে চলিলেন। কেবল শাস্তর-মা, মাঝে মাঝে এক একবার

পশ্চাদিকে চাহিয়া দেখেন ৩ অঞ্চল দ্বারা ছই এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিতে থাকেন। কি ভাবিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন, “বাবা ভ্রমকনাথ কি তাই করবেন? শান্তর-আমার কি আবুর সুদিন আসবে?”

(৫)

লীলা, এতক্ষণ তাহার সেই ডাগর চক্ষু ছটি মেলিয়া, একদৃষ্টে সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিল;—যেন কতদিনের পরিচিত—কে আপনার-হইতেও-আপনার-জন সে পাইরাছে;—তাই আর সকলো-বাড়া গেল দেখিয়াও, সে কাঁদিল না, বা কোন ‘বারনা’ লইল না। সন্ন্যাসীও নির্নিমেঘ নয়নে বালিকার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে চক্ষের পলক আর পড়ে না।

লীলা, দেখিতে বড় সুন্দর। চাঁদপানা মুখ, স্নকুমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। বালিকার রূপে যেন বৃক্ষতল আলো করিয়াছে। নিবিড় মেঘবর্ণ কুঞ্চিত অলকাগুচ্ছ, লীলার সেই নিম্নল মুখখানি জেগৎ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরবে, বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল; অমনি সেই বিভূতিপরিণোভিত গগনস্থল বহিয়া, টস টস করিয়া ছই ফোঁটা গরম জল বালিকার হাতের উপর পড়িল।

এবার বালিকা কথা কহিল। মধুমাখা আধ আধ স্বরে বলিল, “তুমি কাঁদুচ কেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর?”

সন্ন্যাসী, লীলাকে কোলে লইলেন। মুখচুষন করিয়া কহি-

লেন, “না মা, আমি কঁাদি নে। তোমার নামটি কি, বল দেখি মা?”

বালিকা এবার কোন কথা কহিল না, তাহার লজ্জা হইল। ডাগর চক্ষু দুটি এবার ভূমিপানে তৃপ্ত করিল। সন্ন্যাসী আবার কহিলেন, “তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার মুখখানি বড় সুন্দর। তোমার নাম সুন্দরী, না মা?”

বালিকা, এবার হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে সুধার লহরী ছুটিল। তার নাম ত সুন্দরী নয়,—তাই এ হাসি। সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমার নাম কিছু সুন্দরী নয়,—আমার নাম লীলা!”

“লীলা! বাঃ, দিখি নামটি ত! আচ্ছা মা, তোমার এই নামটি কে রাখলে, বল ত!

“কেন,—আমার মা!”

সন্ন্যাসী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া একটু চুপে চুপে কহিলেন, তোমার মার নাম কি, মা?”

“বল্‌বো কেন?—কৈ সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি আমার হাত দেখলে না?”

“হাঁ মা, এই দেখ্‌চি। তুমি একটা আঁব খাবে, মা?”

“না,—মা বক্‌বেন।”

“বক্‌বেন কেন? তোমার বাবা কোথায়?”

“বাবা?—আবার বাবা নেই। মা আছেন, কিন্তু বুদ্ধি তিনিও, আর থাকেন না!”

সন্ন্যাসী আবার একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন, “কেন?”

“বাবার জন্যে কেঁদে কেঁদে তাঁর চোক গেছে ।—মা আমার সময়ে থান না, সময়ে ঘুমোন না,—কেবলই বাবার জন্তে কাঁদতে থাকেন ! আচ্ছা সন্ন্যাসী-ঠাকুর ! আমার বাবা কোথায়, জান ?”

“না !—তোমার বাবাকে তুমি দেখেছ ?”

আধ-আধ মধুমাখা-স্বরে বালিকা উত্তর করিল, “না ।—আমি তখন ছেলে-মানুষ ছিলাম, কিনা, তাই দেখি নে। একদিন ঘোষেদের কাকাবাবুর কোলে উঠেছিলাম, তা’ তাঁর বিজয় বড় রাগ ক’লে;—ব’লে, ‘আমার বাবার কোলে তুই উঠবি কেন ?’ তা আমি নেবে বল্লম, ‘আচ্ছা, আমিও একদিন আমার বাবার কোলে উঠবো।’ দিনিমাকে ব’লে তিনিও ঐ কথা ব’লেন। বলেন, বাবা নাকি আমার জন্তে খাবার আনতে গেছেন। তা আমার আর খাবারে কাজ নি, আমি বাবার কাছে যাব;—আমার বাবাকে দেখতে বড় সাধ যায়। মাকে, বাবার কথা জিজ্ঞাসা ক’লেই মা কাঁদতে থাকেন। আর বলেন, তিনি ঐ আকাশে আছেন ! তা’ ও বড় উঁচু, আমি উঠতে পারব কেন ?”

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে আবার টস্‌টস্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, “তা’ তুমি তোমার বাবাকে ডাক না কেন ?”

“আমি কতবার ডেকেছি, বাবা ত’ আসেন না ! এই দেখ সন্ন্যাসী-ঠাকুর,—এই সকলেরই বাবা আছে;—তাদের বাবা তাদের কত যত্ন করে, আদর করে, আর আমার বাবা নেই ! এ কথা ভাবলে আমার বড় কান্না পায়। কতদিন সকলের আড়ালে কাঁদতে কাঁদতে ঐ আকাশের পানে চেরেছি, আর

মনে মনে বাবাকে ডেকেছি।—তা' বাবা আমার এমনি দয়া-
মায়া হীন যে, আমায় দেখা দেন না।”

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে আবার টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল।
পরে, তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বালিকার হাতখানি ধরিয়া
কহিলেন, “দেখি মা, তোমার হাতখানা?”

এবার বালিকা হাসিয়া কহিল, “আমি বুঝি তোমার মা!
তুমি অত বড় ছেলে,—আমি কি তোমার মা হতে পারি?
আহা, তোমার বুঝি মা নেই?”

“এই যে তুমি আমার মা! আমি তোমার ছেলে!”

সন্ন্যাসী আবার একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ঈষৎ স্মিতমুখে
কহিলেন, “তুমি যদি আমার মা না হও, তা' হ'লে তোমার
বাবা কোথায়, বল্‌ব না।”

বালিকা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, “আচ্ছা, আমি
যেন তোমার মা হলাম।—এখন বাবা কোথায়, বল!”

মনে মনে লীলার বড় লজ্জা হইল। অত বড় বড়ো
ছেলের সে মা! তবু আবার সেই ডাগর চক্ষু দুটি মেলিয়া কহিল,
“বাবা কোথায়?”

সন্ন্যাসী আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না;—সেই
কুসুম-কমনীয় বালিকার মুখচূষন করিয়া, গদগদস্বরে কহিলেন,
“মা, আমিই তোমার সেই হতভাগ্য পিতা! চল মা, ঘরে
যাও।”

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল।

(৬)

মহাস্ত-বাবাজী এতক্ষণ নির্দাক অবস্থায় ছিলেন, এইবার কহিলেন, “প্রভু, এই কি আপনার কথা ?”

শরচ্ছত্র তখন আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। কহিলেন, “বৃথাও এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আমার সোণার সংসার ভাসাইয়া দিয়া, আমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি। শম্ভু, তুমিও গৃহে যাও। নিথ্যা, ঐশ্বর্যের নামে অশ্বর্যের সঞ্চয় করিও না। তুমি আমাকে গুরু ধরিয়াছিলে,—আমিই তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি পুনরায় গৃহী হও। মায়া-ত্যাগ, কাহারও ইচ্ছাবান নয়। আর মায়া-পাশ না কেটে মায়া-পাশা মাজা, সং-মাজা নাও।”

পুরুষ-ঠাকুর, আশপাশেই ছিলেন। অলক্ষণের মধ্যেই এই শ্রুতের সংবাদ শুনিলেন। আক্সাদে উগমগ হইয়া, আজ বিলক্ষণ হুঁ পয়সা লাভ হইবে বুঝিয়া, তিনি শরচ্ছত্রের সঙ্গে গেলেন। আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, “মুখ্যে মশাই, আমাকে সিন্তে পারেনাক ? আমি তোমার সেই কেটে খুড়োর ছেলে। দেখা-পড়া কিছু শিখি নে, পাড়ার পাঁচ জনের কৃপায় আর তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে বাবার ঘণ্টা নেড়ে হুঁমুঠো বাই ! চলুন, ঘরে চলুন। আপনি নিক্শেদে হওয়া অবধি আপনার পারবার মরার-মত হ’য়ে আছেন। আহা ! সতী-সাবিত্রীকে দেবা দিন। ভাগ্যে আজ আপনার স্বাশুড়া-ঠাকুর নার্তীনাটকে নিরে বাবার মন্দিরে এসেছিলেন ! তা না হ’বে কেন, না হ’বে কেন,—বাবার মাহায়ে কি না হ’তে পারে ! আহা, যদি আমার সেই হতভাগ্য

ভাইটাকে আপনার মত গৃহী দেখতে পেতুম ! শষো ছোঁড়ার শোকে, মা-আমার ম'রে আছেন ব'লে হয় !”

বাবাজী শম্ভু আর আয়ুগোপন করিতে পারিলেন না,—
আউ মাউ করিয়া কঁাদিতে কঁাদিতে কহিল, “বাদা, আমিই তোমার সেই হতচ্ছাড়া ভাই ! পেটের দায়ে এতদিন মার্কণ্ড মোহন্ত গেজে বেড়াচ্ছিলুম !”

পুরুত-ঠাকুর ও মার্কণ্ড-বেশী শম্ভু পরস্পরে আলিঙ্গন করিল ও গৃহে গেল ।

লীলা, এই সব ভাবগতিক দেখিয়া ত এতক্ষণ অবাক ! তার চোকে জল, মুখে হাসি । সে শোভা বড় সুন্দর ।

স্নানিকা হাদি কান্ধুখে সন্ন্যাসীকে কহিল, “বাবা ! সত্যি তুমি আবার বাবা ? তবে চল নার কাছে যাই ।”

“চল মা যাই ।”

এই বগিয়া, যেই কুসুমকোমলা, প্রাণময়া, সৌন্দর্য্য-প্রতিমা-
মা-এ কোলে বহিয়া সন্ন্যাসী গৃহাভিমুখে চলিলেন ।

(৭)

অল্পক্ষণের মধ্যেই শরজঙ্গ গৃহে পহঁছিলেন । পতিব্রতা শাস্ত তখন প্রাপ্তবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন । তাঁহার বাম অঙ্গ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল । স্বামীকে দেখিবামাত্র তিনি চিনিলেন । ছুটয়া গিয়া সত্য, স্বামীর পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িলেন । কঁাদিতে কঁাদিতে কহিলেন, “প্রভু, দাসীকে কোলয়া এতদিন কোথায় ছিলে ?”

মুখ ফুটিয়া সকল কথা বাহির হইল না। সতী, শতধারে স্বামীর পাদমূল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

লালা পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া, ছুটিয়া গিয়া মাতামহীকে স্নেহের সংবাদ দিল।

শরচ্ছন্দ্র, কম্পিত কলেবরে, সহধর্ম্মিণীর হাত ধরিয়া কহিলেন, “উঠ উঠ, গৃহলঙ্ঘি-আমার ! আবার তোমাকে লইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে আসিয়াছি। প্রাণাবিকে, স্বামীর শত অপরাধ বিস্মৃত হও।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে শুভসংবাদ সকলের কর্ণগোচর হইল। সকলে তিথ্য উপহিত হইল। লীলা, মাতামহীর হাত ধরিয়া সেখানে আসিল। মাতামহী, কাদিতে কাদিতে জামাতা-কন্যাকে গৃহে তুলিলেন। সে গৃহে-তোলার-আনন্দ, তিনিই বুঝিলেন।

লালা, তার কচি হাতখানি মায়ের মুখে বুলাইয়া, মধুমাখা আধস্বরে কহিল, “আর কাদ কেন মা ? বাবাকে ত ধ’রে এনেছি।”

শাশু, কাদিতে কাদিতে কন্যার মুখচুখন করিয়া কহিলেন, “মা, তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হোক !”

সমাপ্ত।





প্রায়শ্চিত্ত ।

(১)

নারায়ণপুরে এক-ঘর বড় জমিদারের বাস। জমিদারের নাম—প্রতাপনারায়ণ রায়। প্রতাপনারায়ণের প্রতাপ অতি প্রবল। তাঁহার নাম-ডাকে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জঙ্গ খায়। প্রতাপনারায়ণের প্রকৃত জাতি বা বংশ-বিবরণ নির্ণয় করা কঠিন। ‘রায়’ উপাধিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলি প্রভৃতি অনেক জাতি বুঝায়। প্রতাপনারায়ণ, সমাজে আপনাকে কায়স্থকুলতিলক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু গ্রামের দুই লোকে তাঁহার জাতি লইয়া কানাকানি করে। পয়সার ছোরে কেহ তাঁহার জাতি মারিতে বা তাঁহাকে একঘ’বে করতে না পারিলেও, প্রকৃত ভদ্রলোকে তাঁহাকে লইয়া পানাহার করেন না, কিংবা কোন ঘরানা-ঘরে এ খববি তাঁহার কোন বৈবাহিক আদান-প্রদানও হয় নাই।

প্রতাপনারায়ণের কিছু ইহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা ঘটে নাই,—যেহেতু তিনি এক পুরুষে ‘নগদা’ বড়-লোক। ছুনি-য়াকে তিনি দৃকপাতও করেন না। তা’ না কখন,—তাহাতে ছুনিয়ার কিছু বাইতেছে-আসিতেছে না,—নোদা কথা, নারায়ণ-পুরের ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারদিগের সুখ-শান্তিতে বাস করা এক রূপ

দায়'হইয়া উঠিয়াছে। এমন অর্থলোলুপ, পরশ্রীকাতর, দারুণ চম্বন আর গুটিকতক থাকিলেই, এইখানে—এই মনুষ্যসমাজেই “নরক গুল্জার” হইত। সৌভাগ্যবশতঃ, নারায়ণপুরের ভদ্র-লোক মাত্রেই রায় মহাশয়ের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। স্বার্থের খাতিরে, রায় মহাশয় না পারেন, এমন কাজই নাই; সুতরাং প্রায় সকলকেই অল্প-বিস্তার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, রায় মহাশয়ের সহিত মৌখিক সৌহার্দ স্থাপন করিতে হইত।

এই জমিদার-রূপী জীবনের বিশেষ ‘টাশ্’টা—পরের জমি-জমার উপর। কাহারও একটু ভাল বাগান-বাগিচা বা ছ’কাঠা জমি-জিরাং দেখিলেই তাঁহার চক্ষু টাটায়। ছলে, বলে, কৌশলে, বেকুপেই হউক, সেটুকুর দখলিকার হইতে না পারিলে তাঁহার আর স্বস্তি নাই। ইহাতে জাল-জালিয়াতি, ঘুষ-মিথ্যাসাক্ষ্য, প্রলোভন ভয়-প্রদর্শন—বত রকম উপায় থাকিতে পারে, তাহা করিতে তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। কূটবুদ্ধি উদ্ভাবনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। যে কাজটা দশ বৎসর পরে সমাধা হইবে, রায় মহাশয় দশ বৎসর পূর্ক হইতে তাহার “আট-ঘাট” বাধিয়া রাখেন, হরেক রকমের “ফন্দি” উদ্ভাবন করিতে থাকেন। ঠিক যেন ব’ড়ের চাল। যে কিস্তীতে ‘মাং’ করিতে হইবে, তোখড় খেলোয়াড় রায় মহাশয়, ঠিক সেই ক’টি ঘূঁটার উপর সূচন দৃষ্টি রাখেন। ভাল ‘চার’ দিলেই, তখনই হউক আর ছ’দণ্ড পরেই হউক, মাছ আসিবেই। ধৈর্যশীল তোখড় নেছড়ে ভিন্ন সংসার পুকুরে মাছ-ধরা যে-সে ‘আনাড়ী’র কাজ নয়। রায় মহাশয় ইহা বুঝিতেন। বুঝিতেন যে, বাহার বুকের রক্ত চুষিয়া থাইতে হইবে, কি বাহার দেহ হইতে এক বুকুল মাংস

কাটিয়া লইতে হইবে, তার ছোটো কড়া কথা, কিংবা মাথা-মুড় খোঁড়ার প্রতি ভ্রক্ষেপও না করিয়া নিষ্পন্ন, নিশ্চল, নির্জাক পদাঘ-মূর্তির মত স্থির থাকিতে হইবে। এই ‘চাণক্য-নীতিই’ তাঁহার মূল মন্ত্র। তাঁর অনুচর-পার্শ্বচরগণকেও সৰ্বদাই তিনি এই নীতি শিক্ষা দেন। অনুচর পার্শ্বচরগণ হ্রদৃষ্টকমে, গুরু নীতির এই গভীরত্ব সব সময়ে তলাইয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। জমিদার রূপী জীবটি এমনই অদ্বুত বাত্বতে গঠিত।

(২)

এই গ্রামে একঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন। ব্রাহ্মণের নাম—রামরূপ বোষাল। বোষাল মহাশয়ের কিছু জমি আছে। জমিগুলি নিকর ব্রহ্মোত্তর। রায় মহাশয়ের অনেক দিন হইতে এই জমি গুলির উপর ‘টাক’ আছে। তলে তলে তিনি অনেক ‘অন্নি ফন্নি’ও বোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন,—একটু কিছু ‘অর্জিলা’ পাইলেই আয়ুধাং করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু সুবিধা ঘটয়া উঠিতেছে না। পথমে অর্থ প্রলোভন,—দশ টাকার জারগায় বিশ টাকা দর দিয়া খরিদের চেষ্টা;—তাহাতে কিছু ফল হইল না বুঝিয়া, খানকানিজের ও ঘোষালের দুই মাতব্বর প্রজার মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া একটা মোকদ্দমা খাড়া করিলেন। কিছুদিন ধরিয়া উভয় পক্ষে কিছু অর্থের শ্রান্দ হইল। শেষে বোষাল মহাশয়ের প্রজা জয়লাভ করিল। সাধারণ্যে—আদালতে প্রকাশ পাইল যে, রায় মহাশয়ই সকল অনর্থের মূল। তাহারই শিক্ষামত এই মিথ্যা মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। আদা-

লত-শুঁকসকলেই রায় মহাশয়কে “ছিঃ ছিঃ” করিতে লাগিল। প্রজাকে এই বিপদ-জাল হইতে উদ্ধার করিতে ঘোষাল মহাশয়েরও অনেক টাকা খরচ হইল। ব্রাহ্মণ, দুর্দান্ত জমিদারকে উদ্দেশ্য করিয়া, আদালতে—সর্বসমক্ষেই কহিলেন, “রায় মহাশয় ! থামকা এরকম ক’রে এক জনকে ‘তায়রান’ করেন কেন ? সোজা কথায় বল্লেই ত হত,—‘ঘোষাল ! তোমার অমুক জমিটা আমায় ছেড়ে দাও’ মিথ্যা মিথ্যা একটা লোককে মজাইতে যান কেন ? পরকাল আছে,—মরিতে হইবে, এ কথাটা যেন মনে থাকে !”

এইরূপ কিছু মিঠে-কড়া রকমের দুই চারি কথা শুনাইয়া, ব্রাহ্মণ আপন গ্রহ আপনি আনয়ন করিলেন। এই হটতেই ঘোষাল মহাশয়ের উপর জমিদারের বিষদৃষ্টি পড়িল। কিসে ব্রাহ্মণকে উদ্বাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণের ‘ভিটে-মাটী-চাটী’ করিবে, কিসে ঘোষালকে ধনে-প্রাণে মজাইয়া, তাহার যথা-সর্বস্ব আত্মনাং করিবে, নিষ্ঠুর রায়-জমিদারের এখন তাহাই ধ্যান-জ্ঞান হইল।

(৩)

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই, আর একটা মুসলমান প্রজার সহিত চক্রান্ত করিয়া, প্রতাপনারায়ণ আর এক চাল চালিল। ঘোষাল ব্রাহ্মণের প্রতি এবারকার অভিযোগ বড় গুরুত্বর। তিনি নাকি তাহার লোকজন লইয়া রাতারাতি একটা জায়গা দখল করিবার উদ্দেশ্যে, অমুক মুসলমানের ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছেন,

আর আপন দখলি-স্বত্ব প্রমাণের জন্ত, সেই রাতেই নাকি এক বর খাড়া করিয়াছেন। সাক্ষী সাবুদ, দলিল দস্তাবেজ—কোন বিষয়ের কোন ক্রটাই প্রতাপনারায়ণ রাখিল না। দেখিতে দেখিতে নোকদমা ‘সঙ্গীন’ হইয়া উঠিল। প্রতাপ, এবার অপের বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছে। জেলার কোন্সলী উকিল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র নোক্তারটি পর্য্যন্ত হস্তগত কবিয়াছে। কাহাকেও নিযুক্ত করিয়াছে, কাহাকেও বা ‘বাঘনা পত্র’ দিয়া রাখিয়াছে।

ঘোষাল ঠাকুর অকূল পাথারে পড়িলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। প্রতাপ—ধনকুবের, অর্থের প্রতিগন্ধিতায় তাহাকে আঁটিয়া উঠতে পারিবেন না, ইহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, এখন একমাত্র ধর্ম্মই তাঁহার সম্বল। অন্তরে তুর্গানাম জপ করিয়া, ব্রাহ্মণ আকাশপানে চাহিয়া কহিলেন, “মা সর্ষ-মঙ্গলে! কূল দিস্ মা!”

যথাকালে নোকদমা উঠিল। আদালত লোকে লোকারণ্য। বাদী—সেই মুসলমান প্রজা, প্রতিবাদী—ঘোষাল ব্রাহ্মণ। মুসলমান প্রজা নাম মাত্র বাদী,—সকলসকল হইতেছে—হুদাদ প্রতাপনারায়ণ। প্রতাপনারায়ণ যেক্রপ কলকাটী নাড়িতেছে, মামলার গতি সেই দিকে কিরিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে! মামলার ভাব-গতিকে আর প্রতাপনারায়ণ নামক সুনাম-ধন্য জীবটির সুনামের পরিচয়ে, জজসাহেব পূর্ষ হইতেই বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। প্রতিবাদীর পক্ষে উকিল-কোন্সলী জনপ্রাণী নাই দেখিয়া, বিচারক বাহাদুরের পূর্ব-সন্দেহ আরও প্রবল হইল। তিনি যতদূর পারিলেন, আইনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া, অতি ধীরভাবে, বিচক্ষণতার সহিত বিচার কাণ্ড-করিতে

লাগিলেন। মোকদ্দমা একাধিক্রমে সাতদিন চলিল। ধর্ম্মের
কেমন মহিমা!—শেষে সেই অশিক্ষিত আনাড়ী বাদী মুসলমান,
সামান্য একটা জেরার ফেরে মামলাটা একেবারে মাটি করিল।
প্রতিবাদী এককালে অব্যাহতি পাইল। ধর্ম্মের কলে উল্টা
চাপ পড়িল;—মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন জন্য, বাদী মুসলমানের
সশ্রম এক বৎসর কারাদণ্ড হইল।

(৪)

অর্পনাশ, মনস্তাপ, অপমান, নির্যাতনে ক্রুর প্রকৃতি
প্রতাপনারায়ণের প্রকৃতি আরও ভীষণ—ভয়াবহ হইয়া উঠিল।
পাষাণ, এই বার ব্রাহ্মণ রামরূপের প্রাণ লইতে সঙ্কল্প করিল।

রামরূপ অতি নিরীহ প্রকৃতি, নিষ্ঠাপরায়ণ ও ধার্ম্মিক।
জমিদার কর্তৃক বার বার এইরূপ নির্যাতন ভোগ করিয়া, তিনি
এক একবার গ্রাম পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু
মমতাবশতঃ তাহা পারিয়া উঠিতেছেন না।

প্রতাপের চর চারিদিকে। এক দিন গুরিমধ্যে একটু ভদ্র
চর, রামরূপকে হিতৈষী বজ্র ন্যায় উপদেশ দিল, “ঘোষাল
মহাশয়! এ আপনার কিরূপ বুদ্ধি! কুমীরের সহিত বিবাদ
করিয়া জলে বাস করা শোভা পায় না। আপনার যদি ভালর
ইচ্ছা থাকে, তবে জমিদার বাবুর শরণাপন্ন হউন। বার বার
যে, সকল মোকদ্দমাতেই জয়লাভ করিবেন, এমন কিছু কথা
নাই।”

• ব্রাহ্মণ একটা নিম্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “তুমি যাহা

বলিতেছ, কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু তাই, বল দেখি, সাধ্য সম্বন্ধে ; কে আপন বিষয় পরকে দেয় ? ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল মূল—আমার এ সোণার বিষয়,—আজ সাত পুরুষ ভোগ করিয়া আনিতেছি,—হঠাৎ ছাড়িতে মমতা হয় না কি ? আর ঐ মামলা-মোকদ্দমার কথা বাহা বলিলে, তাহা আমিও বুঝি। আমিও বুঝি যে, আইনের চক্ষে ধূলি দেওয়া বড় বেশী কথা নয় ! কিন্তু তাই, উপরে একজন আইন-ওয়ালার আছে, তার চক্ষে ধূলি দেওয়া ত কারও সাধ্যাত্ত নয় ! আমার সেই আইন-ওয়ালাই ভরসা।”

ব্রাহ্মণ মধ্যো মধ্যো মনকেও এইরূপে প্রবোধ দেন।

এদিকে সেই মুসলমান-প্রজার কারদণ্ড হওয়া অবধি প্রতাপ এক দিনের জ্ঞাতও স্মৃতির নহে। অর্থনাশ, মমস্তাপ ত আছেই,—তার উপর দেশ ঘুড়িয়া তাহার একটা মস্ত কলঙ্ক রটিল। বেকার বওয়ালে বালকদল নাম ভাঁড়াইয়া, জমিদারের নামে নানা কুৎসিত রচনা গায়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই সব পয়্যার-গানে রায়-জমিদারের বংশাবলীতেও টান পড়িল। ছাপার আখরে, কখন বা হস্তাক্ষরে সেই সব পয়্যার বক্ত-তত্ত্ব বিরাজ করিতে লাগিল।

পাড়ার অনাহুত-সমিতি অমনি যেখানে সেখানে বৈঠক বানাইয়া, অথচ ভিতরে ভিতরে একটু মজা দেখিয়া, সেই সকল পয়্যার-গানের প্রতিবাদে তৎপর হইলেন ;—“তাই ত, এ বড় অজ্ঞায় কথা,—এর প্রতিকার হওয়া উচিত” ইত্যাকার ভূমিকা ঘাঁড়িয়া, তাঁহারা জমিদার প্রভুর অনুগ্রহলাভের সুযোগ ধুঁজিতে লাগিলেন এবং সাধ্যমতে আপন আপন ‘সতীপনার’

পরিচয় দিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁরা যে এর মধ্যে নন, সেই কথাটা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হইলেন।

এ যত কিছু অনর্থ, যত কিছু বেয়াদবি—এ সকলেরই মূল—রামরূপ ঘোষাল, প্রতাপনারায়ণ এইরূপ বুঝিল। বুঝিল যে, সেই বিট্লে বামন হইতেই তার ইজ্ঞতের উপরেও টান পড়িয়াছে! পাপিষ্ঠ, সেই নিরাহ রামরূপের উপর দিয়াই সকল রাগ ভূমিতে সঙ্কল করিল।

(৫)

আজ কয়দিন অবধি প্রতাপের জন কত চর, রামরূপের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রাহ্মণ কখন কোথায় যায়, কখন কি করে,—তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান লইতেছে। আর মামলা মোকদ্দমায় জেরবার না করিয়া—ততদিনও ধৈর্য্য না থাকায়, পাপিষ্ঠ প্রতাপ, ব্রাহ্মণকে ‘গুম-খুন’ করিয়া ইহজগৎ হইতে অস্থহিত করিতে সঙ্কল করিল।

রামরূপ নিজেই আপনার জমি-জমা দেখিতেন, আদায়-উম্মলও নিজে করিতেন। কেবলমাত্র একটি কৈবর্ত মুহুরি ছিল। মুহুরিটিও মধ্যে মধ্যে মনিবের সহিত খাজনা-পত্র আদায় করিতে যাইত। নারায়ণপুর হইতে তিন মাইল পথ ব্যবধানে গোপালপুর নামে একটি পল্লী আছে। তথায়, কয়েক ঘর মাত্র কৃষিজীবী প্রজা বাস করিয়া থাকে। নারায়ণপুর হইতে গোপাল-পুর যাতায়াত করিতে স্বতন্ত্র পথ নাই,—একটা বড় মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়।

ঘোষাল ব্রাহ্মণ আজ অপরাহ্নে সেই মুহূর্তটিকে লইয়া, গোপালপুরে কিছু খাজনা সাধিতে গিয়াছেন। প্রতাপের চর এ সন্ধান রাখিয়াছে। খাজনা-পত্র আদায়-উত্থল করিয়া, উভয়ের বাড়ী ফিরিতে যে রাত্রি হইবে, চর এ খবরও লইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া, আজ সে পিশাচ-প্রভুকে সংবাদ দিল। চর—মুসলমান।

(৬)

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রি—কৃষ্ণপঙ্কজের চতুর্দশী। পাপিষ্ঠ প্রতাপ একাকী এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া, কি ভাবিতেছে; এমন সময় সেই চর আসিয়া চুপি চুপি সংবাদ দিল,—“হজুর! কল্প শেষ কর্তে হয় ত, আজ করুন। এমন সুবিধে আর ঘটেবে না।

পাপিষ্ঠ প্রতাপের হৃদমনীয় প্রতিহিংসাবৃত্তি হ হ জ্বলিয়া উঠিল। পিশাচ, ব্রাহ্মণকে সহস্রে বধ করিবে, সঙ্কল্প করিল এবং অহুচরকেও সেইরূপ কহিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিল, “বেটার বৃকের রক্ত চুষে খাব, তবে আমার নাম প্রতাপ রায়!—তবে আমি কটকী কায়েত!”

চর বিনীতভাবে উত্তর করিল, “হজুর! এ নফরের, বিবেচনায় আপনার নিজের আর সে কাজটা ক’রে কাজ নেই। হজুরের অনুমতি পেলে আমরাই সে কাজটা সাবাড় করি।”

প্রতাপ কি ভাবিল। বসিয়া ছিল, অস্থিরচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। হিংস্র-প্রতিজ্ঞা-বাক্যক মুষ্টি আরও দৃঢ় করিয়া, কক-

স্বরে কহিল, “ভাল, তাই হোক । কিন্তু দেখিস, যেন শিকার হাত-ছাড়া না হয় । তা’ হ’লে তোদেরও ধড়ে প্রাণ থাকবে না ।”

চর কহিল, “খোদার কিরে ! হজুর ! জান্ থাকতে শিকার ছাড়বো না ।”

চরের নাম রহিমুদ্দীন । রহিমুদ্দীন আবার কহিল, “হজুর ! এখন আর বেণী কথা ক’বার সময় নেই । বকাউল্লা, নূরজান, করিমবক্স—তিন জনকে নিয়ে আমি এখনি চল্লুম । বখন হজুরের মেহেরবাণী পেয়েছি, তখন এখনি সে ছ’ বেটারই মুও হাজির কচ্ছি ।”

প্রতাপ কহিল, “দেখিস, খুব সাবধান ! যেন পশু পক্ষিতেও টের না পায় ।”

পিশাচ-চর একটু বিকট হাসি হাসিয়া কহিল, “হজুরের কৃপায়, ও ক’রে ক’রে আমরা পোক্ত হ’য়েছি, সেজন্য কিছু ভাববেন না । তবে আমাদের জলপানিটা—

প্রতাপ কহিল, “আচ্ছা, যা’ ব’লেছি, তার ডবল পাবি ! এখন যা—কাজ শেষ ক’রে আয় ।”

নরবাণী অনুচর, পিশাচপ্রভুকে একটা সেলাম ইকিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল । পাপিষ্ঠ প্রতাপও বিকটোল্লাসে একটা চীৎকার করিল ।

(৭)

এদিকে রামরূপ ও তাঁহার মুহুরির, খাজনা-পত্র সাধিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল । একজন প্রজা ঘোষাল মহাশয়কে

কহিল, “বাবা ঠাকুর ! আজ এ রাত্রে আর আপনাদের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। আমার এখানে ‘পাকশাক’ ক’রে ‘আজ রাত্রি কাটান, কাল ভোরের সময় এখান থেকে রওনা হ’বেন।” ঘোষাল মহাশয় কহিলেন, “না, রাত আর রতই বা হ’য়েছে ! বাড়ী পৌছিতে নয় চার দণ্ড হোক ! আমার বাড়ীতে কেউ নেই,—আমাকে যেতেই হ’বে। জানই ত, প্রতাপ-নারাণের সঙ্গে মনাত্তর করা, আর কুমৌরের সঙ্গে বিবাদ ক’রে জলে বান করা, একই কথা। কি জান, মুহুরীটি অবধি সঙ্গে এসেছে, বাড়ীতে আর কেউ নেই। গুণধর জমিদারের কল্যাণে কখন কি হয়, তা ত বলা যায় না !”

প্রজা। তা বটে। তবে আসুন, প্রাতঃপ্রণাম হই।

ঘোষাল মহাশয় শ্রীচূর্ণানান জপ করিয়া যাত্রা করিলেন। মুহুরীটি আলো ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহার এক হাতে একটি লণ্ঠন, আর এক হাতে মসী-শোভিত একটি দপ্তর। চতুর্দশীর অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া বড় জোর হই দণ্ড রাত্রি হইয়াছে,—এরি মধ্যে ঘোর অন্ধকার। সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে সর্বত্রই অন্ধকার। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মুহুরির হাতে একটি মাত্র ক্ষীণালোক। পল্লীটির আকাংক্ষা পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ, মুহুরির সহিত মাঠে পহুছিলেন। মাঠে পহুঁছিয়াই উভয়ের হৃদয় একবার কাঁপিয়া উঠিল।

মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ, মুহুরির সহিত জমি জমার কথা সুচিয়া দিলেন। কথাবার্তার কিছু পথ নিঃস্বপ্নে অতিক্রম করিলেন।

মুহুরির সহিত মাঠের মধ্যস্থানে আসিয়াছেন, এমন সময়ে মুহুরি তাহার সেই হস্তস্থিত ক্ষাণালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, 'একস্থানে কয় জন বমাকৃতি পুরুষ লগুড় হস্তে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে বলাবলি করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে তাহার পা আর উঠিল না,—সে, বিহ্বলচিত্তে প্রভুর পানে চাহিয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ ঘোষালও স্তম্ভিতভাবে ইঙ্গিত করিলেন, “কি ?”

মুহুরি কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অতি কষ্টে অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখাইল। ব্রাহ্মণ সে দৃশ্য দেখিয়া একটু সাহস বৃদ্ধির জন্ত একবার গলা সাড়া দিলেন। কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, “কে তোমরা ?”

ব্রাহ্মণের মুখে সকল কথা ফুটিতে-না-ফুটিতে সেই নরহস্তা মারকাঁ চতুষ্টি চকিতের ন্যায় তথায় আবির্ভূত হইয়া ভীমবেগে, উভয়ের মস্তকে লগুড় প্রহার করিল। “মাগো” বলিয়া মুহুরি ধরাশায়ী হইল। তাহার হস্তস্থিত সেই ক্ষাণালোকও নির্বাণ হইল। “কে রে চণ্ডাল” বলিয়া ব্রাহ্মণও ভূপতিত হইলেন। অমনি উপন্যাসের সেই আহত ব্যক্তিদ্বয়ের উপর প্রহার-বৃষ্টি হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়েরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

নরবাতী পিশাচগণ কার্যোদ্ধার করিয়া দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল।

(৮)

সেই কাল-রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র নারায়ণপুরে 'হলস্থল পড়িয়া' গেল। গোপালপুরের মাঠে দুই ব্যক্তি খুন হইয়াছে,—মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সংবাদ চারিদিকে রাড়ি হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে আরও প্রকাশ পাইল যে, সে আহত ব্যক্তিবয়—রামরূপ ঘোষাল ও তাঁহার মুহুরি !

ঘোষাল-পরিবারের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। পথে, ঘাটে সঙ্গত্ৰই “লাল-পাগড়া” দেখা দিল। দারোগা, জমাদার ও কন্সটেবল প্রভৃতি লোক জন চারিদিকে বিরাগ করিতে লাগিল, চারিদিকে ‘সুরখাল’ বদিয়া গেল। কত নির্দোষ ব্যক্তিকে অবস্থা ‘হায়রান্’ হইতে হইল। পুলিশ, বাহাকে ‘নোবে’ করিতেছে, তাহাকেই ধরিতেছে, বাধিতেছে, গ্রহণ করিতেছে। চারিদিকে এজাহারের ধুন পাড়িয়া গেল।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। খুনীর উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। শেষে খোদ মাজিষ্টর সাহেব আসলেন, অনেক তবির-তদন্ত করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চারিদিকে পুলিশের চর, (ডিটেক্টিভ) নিযুক্ত হইল। ডিটেক্টিভের দল বহুরূপী মাজিয়া নানা ছাঁদে—নানা ফাঁদে বেড়াহতে লাগলেন। খোদ কোম্পানী হইতে ‘খুনে’ ধরিয়া দিবার পুরস্কার ঘোষিত হইল। কত লোকে কত-রকম-কি কাণাঘুসি করিতে লাগিল;—“তাই ত, এতদিন নয় ততদিন নয়—ঠাণ্ডা রানরূপ ঘোষাল ও তার মুহুরীকে খুন করতে গেল কে ? উঁহঁ ! এ ঐ দারুণ ছাঁদে প্রতাপ রায়ের কন্স !” প্রায় সকলেরই মনে এই

বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু মুখ কুটিয়া কেহ কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিল না। পাপিষ্ঠ প্রতাপও সেই খুনের দিন হইতে কেমন-এক-রকম হইয়া গেল। কাহারও সম্মুখে বড়-একটা বাহির হয় না, কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কয় না, চোকো-চোকি দেখা হ'লেই চোক নামায়। দু'একটা কথা কহিতে গেলেও জীবের জড়তা প্রকাশ পায়। থাকিয়া থাকিয়া, চমকিয়া উঠে। পাপিষ্ঠ শিরঃপীড়ার অছিলা করিয়া, একেবারে শয্যাশায়ী হইল। অন্তঃপুরে স্নান, অন্তঃপুরে আহার, অন্তঃ-পুরেই সব !

পুলিশের মনেও সন্দেহ জন্মিল,—প্রতাপ রায় হইতেই এই নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ প্রমাণভাবে, তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

(৯)

ঘোর মানসিক বিকারে দেখিতে দেখিতে পাপিষ্ঠ প্রতাপ শয্যাশায়ী হইল। চিকিৎসক আসিল, রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। পাপিষ্ঠ রহিয়া রহিয়া চমকিয়া উঠে ও বিকলকণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকে। শেষে ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। চিকিৎসক, রোগ অতি সাংঘাতিক বুঝিয়া, বিদায় গ্রহণ করিল।

মহাপাপীর চক্ষে নিদ্রা নাই। সে, দিন রাত প্রলাপ বকে ও মাথামুড় খুঁড়িতে থাকে। সে প্রলাপের মর্ম্ম এই,—“ঐ ধরিতে আসিল, ঐ বাধিতে আসিল, ঐ মারিতে আসিল ! ওরে,

আমায় ছেড়ে দে! দোহাই তোদের, আমায় খুন করিস্ নৈ!
'উঃ! নরহত্যা!—ভীষণ নরহত্যা! রামরূপ ঘোষাল!.. আমি
আর তোমার জন্ম লইব না! আর তোমায় বিপদে ফেলিতে
চেষ্টা করিব না! আমায় ক্ষমা কর!'

দিনের পর দিন গেল, মাস গেল; এক ঋতুর পর আর এক
ঋতু যায় যায়, পাপিষ্ঠ প্রতাপের দারুণ ব্যাধির আর উপশম
নাই,—রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

চিকিৎসকের পরামর্শে রোগীকে স্থানান্তরিত করা হইল।
সুহস্র সুহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতে লাগিল। সকল রকম চিকিৎসা
চলিল,—মহাপাপীর এ যাত্রা আর পরিত্রাণ নাই।

(১০)

পশ্চিমাঞ্চলে, একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রতাপ আনীত হই-
য়াছে। পাপিষ্ঠের আত্মীয়-স্বজন সকলেই সঙ্গে আছে। একটি
প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে।

এখানে আনিয়া পাপিষ্ঠের মস্তিষ্ক আরও বিকৃতভাব প্রাপ্ত
হইল। নিদ্রা ত হতভাগ্যকে এককালে ত্যাগ করিয়াছে;—যদি
বা অতি অল্পক্ষণ মাত্র একটু তন্দ্রা আইসে, মহাপাপী তখনই
আবার সেইরূপ প্রলাপ বকিতে থাকে। অধিকন্তু, সেই তন্দ্রা-
বস্থায় বিছানা হইতে উঠিয়া, ঘর 'হাচাবাচা' করিয়া বেড়ায়।
যেন কোন অতীতবস্তুর অনুসন্ধান করিতে থাকে,—তাহা
আর মিলে না।

এইরূপ তন্দ্রাবস্থায়—যখন আর সকলে গভীর নিদ্রায়

অভিভূত,—পাপিষ্ঠ একদিন সকলের অজ্ঞাতে শয্যা হইতে উঠিয়া, মশারির সমস্ত দড়ী গুলি ছিঁড়িল। সেইরূপ অন্ধ-জাগ্রত—অন্ধ নিদ্রিত অবস্থায় সেই দড়ীগুলি উত্তমরূপে পাক-ইয়া দৃঢ় করিল। মনে মনে কি-ভাবিয়া, একটা ফাঁসি তৈয়ার করিল। পরে, বিকট হাত্তের সহিত, একটা বড় চোকির উপর উঠিয়া, সেই ফাঁসি, গৃহস্থিত একটা ছকে সংলগ্ন করিল। সে দিন অমাবস্যা,—ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। সে ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে কোলের মানুষও চেনা যায় না। বাহিরের অন্ধকার একরূপ ঘন, আর পাপিষ্ঠ প্রতাপের ভিতরের অন্ধকারও তদ্রূপ ভয়াবহ। সুরে সুর মিলিল।

পাপিষ্ঠ যেন তখন সহস্র কর্ণে গুনিতে পাইল,—“আত্ম-হত্যা”! সেই সৃষ্টাভেদ্য গভীর অন্ধকারে চারিদিক ভেদ করিয়া পাপিষ্ঠের কর্ণে বাজিতেছে,—“আত্মহত্যা”! সন্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে—সকলই যেন ধ্বনিত হইতেছে,—“আত্মহত্যা”! যেন কোন বিকট-দর্শন—অতি ভীষণ ভয়াবহ-মূর্ত্তি—এক হস্তে রজ্জু, অগ্নি হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারী ধারণ করিয়া কাহতেছে,—“আয় আয় মহাপাপী, আমার কাছে আয়! নরহন্তা নারকীয় প্রায়শ্চিত্ত এ পৃথিবীতে নাই! ঐ দেখ, মহানরক তোর সন্মুখে! আয় আয় পাপী, তোর আমায় আলিঙ্গন করি!”

হোঃহোঃ বিকট-হাত্তে সেই নৈশ-প্রকৃতির নিস্তরূতা ভেদ করিয়া মহাপাপী প্রতাপ সেই লম্বমান রজ্জু-ফাঁসিতে গলদেশ অর্পণ করিল। ঠিক সেই সময়ে যেন রামরূপ ঘোষালের প্রেতাঙ্গা তাহার সন্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিল, “প্রতাপ,

আত্মহত্যাই তোমর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ! আশীর্বাদ করি,
“নরকেও যেন তোমর স্থান না হয় !”

পর্দাপট প্রতাপও বিকটোল্লাসে, রজ্জুতে ঝুলিয়া পড়িয়া,
পাদদেশস্থ কাষ্ঠাসন দূরে নিক্ষেপ করিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত
হইল !

পরদিন প্রভাত-কিরণের সহিত সকলে সবিষ্ময়ে দেখিল,
দারুণ মানসিক-বিকারে আত্মহত্যা করিয়া পাপিষ্ঠ প্রতাপ
হইলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে !

আজিকার দিনে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে একরূপ প্রতাপ বিরল
নয়,—প্রতাপের কাহিনী বড় গল্প নয়।

সমাপ্ত ।





গণনা ।

(১)

রামেশ্বর দত্ত কতাদায়ে বড়ই বিব্রত । আজকালের বাজারে, ধার বছরের আইবুড় মেয়ে যে, কিরূপ গলগ্রহ, তাহা অনেকেই হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছেন । দত্তজ মহাশয়ও বুঝিলেন । বুঝিলেন যে, শীত্রই মেয়ের বিয়ে না দিলে, তাঁহার আর কিছুতেই শ্বশ্রু নাই । বিশেষ, দত্তজের অবস্থা বড় মন্দ । দিন চলা ভার । এমন অবস্থায়, সৎপাত্রের কতাদান, বড় কঠিন কথা ।

তবে একটুমাত্র সুবিধার কথা এই, মেয়েটি দেখিতে বড় সুন্দর । ফুট-ফুটে, টুকটুকেটি । নলিনী ত নলিনীই বটে । মেয়েটি দেখিতে যেমন সুন্দর, গুণেও তেমনি সুন্দর । ঘরের কাজ-কর্মে, লোকের সেবা শুশ্রুষায়, ছোট ভাই-বোনদের যত্ন-আদরে, নলিনী সকলেরই স্নেহের পাত্রী । এ ছাড়া, লেখা-পড়া ও স্কুল-কলেজ-কার্যেও তাহার অনুরাগ আছে ।

কিন্তু হইলে কি হয়,—যেমন কাল, তেমনই ব্যবস্থা ! আজ-কালকার লোক-গুলা কেমন এক রকমেরই । উদ্ধাহ-বন্ধনটা যেন একটা ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । কেবলই টাকা—টাকা—টাকা ! এই টাকার জোরে, এখন মৌলিক কুলীন হইতেছে ; গণ্ডমূর্থও বিধান-সমাজে স্থান পাইতেছে । দত্তজের পরমা

নাই,—কিন্তু আর সকলই আছে। তিনি একজন ঘরণা-ঘরের ছেলে,—সভ্য, ভব্য ও শিক্ষিত। তবে বিধির বিপাকে পড়িয়া, এক্ষণে দারিদ্র্যের কণ্টকাকীর্ণ মুকুট মাথায় পরিয়াছেন! বিশেষ, মেয়ের বিয়ের ভাধনা ভাবিয়া ভাবিয়া, দত্তজের আহার-নিদ্রা লোপ পাইয়াছে। শত স্থানে সদ্বন্ধ হইল, শত স্থানেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। টাকাই ইহার মূল্যধার। এইভাবে কিছুদিন গেল।

(২)

দত্তজের বড় ছেলেটির নাম প্রকাশ। প্রকাশ প্রবেশিকা পরীক্ষার পঠ অধ্যয়ন করিতেছে। প্রকাশ, ছেলেটি ভাল। লেখাপড়ায় খুব অনুরাগ আছে। কিসে পূর্ব পুরুষদের কীর্তি-কলাপ সজীব রাখিবে; কিসে বাপ-মায়ের দ্বন্দ্ব ঘুচাইবে; কিসে দেশের মধো একজন হইবে,—এই সকল সদিচ্ছা, অনুরাগ তাহার অন্তরে জাগিত। এই স্রবুজি বালকই দত্তজের এখন একমাত্র আশা-ভরসা-স্থল। প্রকাশের মুখখানি দেখিয়া, তিনি সকল কষ্ট সহ করেন, মনকে প্রবোধ দেন।

কিন্তু উপস্থিত কতাদায়ের ভাবনা, পুত্রের মুখ দেখিয়া নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না। কেন না, এটা যে হাতাহাতি—এখনই চাই! শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, মেয়ে তেরয় পা দিতে যায়, কাজেই দত্তজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শেষে, প্রকাশের বিবাহ দিয়া, সেই টাকাতেই মেয়ের বিশে দিবেন, স্থির করিলেন।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা! প্রকাশের 'দলিল' কি? কি দেখিয়া লোকে এখন তাহাকে কল্যাণদান করিবে? বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'চাপরাস' থানা বাগাইতে পারিলে, তবে না প্রকাশের স্মারক দাড়াইবে? হাঁ, তখন দত্তজের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে বটে! শুধু মনস্কামনা পূর্ণ কেন,—তখন তিনি কিছু সংস্থানও করিয়া লইতে পারেন। কেন না, তখন যে তিনি পাস-করা-ছেলের বাপ! আর, এখন?—এখন তিনিও যা, আর পথের ধূলিমাটিও তা'।

(৩)

অল, তা-ই স্থির করিলেন। আর ছয়মাস পরে প্রকাশের বিবাহ দিয়া, তার পরে মেয়ের বিয়ে দিবেন। কিন্তু এ ছটা মাস, দত্তজের পক্ষে, যেন ছটা যুগ বোধ হইল। দিন আর কাটে না। কোন রকমে, মরার-মতন হইয়া, পুত্রের পরীক্ষার কাল গণনা করিতে লাগিলেন; এদিকে মেয়েও তের ছাড়াইয়া চোন্দ্র পা দিল। এ দৃশ্য, দত্তজ, অতি কষ্টে দেখিলেন। কেন না, আগামী সপ্তাহে প্রকাশ পরীক্ষা দিবে; তাহার এক মাস দেড় মাস পরেই, পাসের খবর বাহির হইলেই, দত্তজ দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। 'সাত সরিষা' দিয়া গম্ভীর্য করিবেন। যতক্ষণ খাস, ততক্ষণ আশ! টাকা নাই বলিয়া, কোন্ পিতা, অপাত্রে কল্যাণদান করিতে পারেন?

প্রকাশ যে পাস হইবে, সফলেরই ইহা দ্রুত বিশ্বাস। দত্তজ এক একবার এ স্মৃতির কলনায় বিরলে আনন্দাশ্রু পাত করেন।

কেন না, প্রকাশ পাস হইলে, তাহার বিবাহের টাকায় কতাদায় হইতে নিকৃতিলাভ করিবেন। নহিলে যে, তাঁহাকে জাতিচ্যুত—ধর্মচ্যুত হইতে হয়।

কিন্তু হা ভাগ্য! পরীক্ষায় প্রশ্ন-চুরী-উপলক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মহা বিভ্রাট বাবিয়া গেল। চুরী ধরা পড়িল—পরীক্ষার পরে। আগে ধরা পড়িলে অনেক ছেলের পরকাল আর জন্মের মত নষ্ট হয় না।

যথা সময়ে আবার পরীক্ষা গৃহীত হইল। প্রকাশও আবার পরীক্ষা দিল। কিন্তু হায়, দত্তজের কপালক্রমে, প্রকাশ এবারকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। অনেক ভাল ছেলের অদৃষ্টে, এই রকমই ঘটিল।

দত্তজের দ্বাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। যে আশায় এতদিন বুক বাধিয়াছিলেন, সে আশালতা নিশ্চূর্ণ হইল। এদিকে নলিনী, চোদ্দও উত্তীর্ণ হয়। মেয়ের সুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। পিণ্ডাচের দেশ হইয়াছে, দয়া-ধর্ম-মায়া সকলই বাইতে বসিয়াছে,—একমাত্র অর্থাভাবে, দত্তজ, এ মহা দায় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছেন না।

দিন চলা ভার। ছেলেকেও আর লেখা পড়া শিখাইতে পারিলেন না। সুতরাং দত্তজের সকল আশা-ভরসা লোপ পাইল। মেয়ের ভাবনা ভাবিয়া, তাঁহার অস্থি চর্ম্ম-সার হইল। তিনি সত্ত্বরই কঠিন রোগগ্রস্ত হইলেন; এবং দেখিতে দেখিতে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই, কালের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন।

বিকার-কালে চিন্তাতুর হতভাগ্য পিতার মুখ হইতে, কেবলই মেয়ের বিয়ের প্রলাপ উচ্চারিত হইয়াছিল।

(৪)

অল্প বয়সেই প্রকাশের মাথায়, সংসারের গুরুভার পড়িল। অতি কষ্টে, কোন প্রকারে পিতৃদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া, প্রকাশ ভগিনীর বিবাহ-দায়ে বিব্রত হইয়া পড়িল। আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে ছিল, একে একে সকলের শরণাপন্ন হইল, পায়ে ধরিল। কিন্তু এ ছঃসময়ে কেহই তাহার আঁতের ব্যথা বুঝিল না। সকলেই মুখে “আহা, আহা” করিয়া বিদায় দিল।

একে একে সকল স্থলে নিরাশ হইয়া, প্রকাশ গৃহে ফিরিল। ছঃখিনী মায়ের মুখ দেখিয়া, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। অভাগিনী জননাও, পুত্রের সহিত যোগ দিলেন। কাঁদিতে, কাঁদিতে, দেবতার চরণে ছঃখের কাহিনী নিবেদন করিলেন। মাতাপুত্রের অনেকক্ষণ, এই ভাবেই অতিবাহিত হইল।

ক্রন্দনে, শুভ ফল ফলিল। দেবতার চরণে আত্মের কাতরোক্তি স্থান পাইল।

বস্তুতঃ, আজ প্রায় তিন বৎসর যাবৎ শত চেষ্টায়ও বাহা হয় নাই,—এক দিনের, কয়েক মুহূর্তের, সামান্য একটি ঘটনায়, তাহা* হইল। হঠাৎ একজন বিদেশী লোক আসিয়া, এক সম্বন্ধ উপস্থাপিত করিল। কতাপক্ষের কোন খরচপত্র নাই, বরকে কিছুই দিতে হইবে না;—এমন কি, বিয়ের খরচটাও বরপক্ষ দিতে প্রস্তুত আছেন।

পরম্পরায় জানা গেল, পাত্র অতি সৎ। এমন সৎপাত্রের কৃত্য দান করা স্নাঘার কথা। মাতা পুত্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না। মনে মনে ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিল।

বরপক্ষের লোক, মেয়েকে পাকা দেখিয়া ঘাইতে চাহিলেন। সামান্য বেশভূষায় নলিনীকে তথায় আনা হইল। কিন্তু সেই সামান্য বেশেই স্বভাবসুন্দরীর শোভা শতগুণে বদ্ধিত হইল। লোকটি দেখিলেন,—ক'নের চাঁদপানা মুখ, সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব। প্রীতিপ্রসন্ন মনে তিনি ক'নেকে ধান-ছর্য্যায় আশীর্বাদ করিয়া, শুভদিন স্থির করিলেন।

আনন্দে মাতা-পুত্রের চক্ষে টস্টন্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রকাশ, কৃতজ্ঞদদয়ে সেই ভদ্রলোকটির চরণে, মাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। গদগদকণ্ঠে কহিল, “আপনি যিনিই হোন,— আজ আমার পিতার কাজ করিলেন। আপনার ঋণ জীবনে শুধিতে পারিব না।”

প্রকাশের মাও, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া, আবেগভরে পুত্রকে কহিলেন, “জানিস না ~~কি~~, উনি ঈশ্বর-প্রেরিত। ভগবান ওঁকে পাঠিয়েছেন। আমি ওঁর বয়সে বড়,—আমি এই আশীর্বাদ করি, যেন উনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করেন।”

ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে কহিলেন, “মা, আনাকে সম্মান-তুল্য ভাবিবেন। আমার কাছে ওরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যক নাই। কে, কা'র ভাল করিতে পারে, মা ? যাঁর কাজ, তিনিই করিলেন, জানিবেন !”

কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল, ভদ্রলোকটি বরের একজন বিশিষ্ট আত্মীয়। বরের রূপ আছে, গুণ আছে ;—তা ছাড়া বর সম্ভ্রান্ত

ঘরেব ছেলেও বটে। তার উপর বি-এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কেবলই মেয়ের রূপ-গুণের পরিচয় পাইয়া, আর দত্তজের প্রশংসাও কথা শুনিয়া, বরপক্ষ বিনা-পরামর্শে, এ শুভ কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ভদ্রলোকটি, একে একে এই সকল এবং আরও অনেক কাজের আলোচনা করিয়া, যথাসময়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদাহের সমস্ত আয়োজন হইল।

(৫)

আজ বিবাহ।

প্রাতে, প্রকাশের জনৈক আত্মীয়, পাড়ার একজন নামজাদা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কাছে, বর ক'নের কোজির ফলাফল জানিতে চাইলেন। তিনি হন একটী নিকামধর্মী মহাত্মা! আত্মীয়দের কোন একটা হিত করা ত তাঁর চাই! তাই তিনি মনে মনে কি ভাবিয়া, নিঃস্বার্থভাবে, বিশেষ অনুরাগ সহকারে গণকঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। গণকঠাকুর অগ্রেই কোষ্ঠী গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে কেমন একটা খটকা লাগায়, ঠিক কিছু উত্তর কাহা-কেও দেন নাই। প্রকাশ এবং তাহার মাও আর ও বিষয় জানিবার জন্ত, বড় একটা উৎসুকও হইলেন না। কিন্তু নিকাম-ধর্মীগণ ত আর তোমার আমার মত চুপ করিয়া থাকিবার লোক নন,—তাঁরা জগতের জন্ত সদাই ব্যস্ত! তার সাক্ষী এই দেখ না, প্রকাশ তার ভগিনীর বিবাহ দিতেছে, তার বত না ভাবনা, তার মায়ের বত না চিন্তা, অনাহত আত্মীয়টির কিন্তু তা

অপেক্ষাও অধিক ভ্রংশক্য। তাই আজ ভোর হইতে-না-হইতে, গগক ঠাকুরের বাড়ীতে ‘ধন্না’ দিয়া আছেন। গগকঠাকুর তাঁর মন্তব্য পাস করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তাহাতেই ‘নিকামধন্নার’ও কোণ্ঠীর ফলাফল জানিবার বাসনাটা বেশী বলবতী হইল।

একান্ত অমুরুদ্ধ হইয়া, গগকঠাকুর তাঁহার পাঞ্জি-পুথি আনিলেন। শেষে, আত্মীয় লোকটিকে মাথা-মুণ্ড বুঝাইয়া, স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন যে, মেয়েটির অদৃষ্টে “বৈধব্য-যোগ” আছে! আর পাত্রের কোণ্ঠীখানি দেখিয়া বলিলেন, “কিস্তি ছেলেটা ত দেখছি, ‘বিপন্নীক’ হ’বে। অথচ বিবাহের সকলই প্রস্তুত।—আমি এর কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।”

নিকামধন্না উত্তর করিলেন,—“হঁ”!

কিস্তি সেই এক ‘হঁ’তেই তাঁর তিতরের ভাবটা বেশ বুঝা গেল। তিনি তখনই, ধীর পাদক্ষেপে, কুঞ্চিত কটাক্ষে, তথা হইতে উঠিলেন। যথায় বরপক্ষ বাসা লইয়াছেন,—(বর অনেক দূর দেশের; তায় আবার গাঙ-খালের পথ, সময়টাও ঝড়-তুফানের; সুতরাং বরপক্ষায়েরা বর ও পুরোহিত সমেত এক-দিন পূর্বে উপস্থিত হইয়াছেন)—সেইখানে ধারে ধীরে উপনীত হইলেন। এবং সেই স্বাভাবিক বক্রদৃষ্টি আরও বক্র করিয়া, মিছারির ছুরির মত একটু হাসি অধরোষ্ঠে দেখাইয়া, বরকন্ডার পার্শ্বে বসিয়া আবার ফিক্ করিয়া হাসিলেন। তারপর নেহালাবটি বিবাহ-বন্ধনের গুরুত্ব বুঝাইয়া এবং পতি-পত্নীর অনন্তকালের আধ্যাত্মিক-মিলন প্রমাণ করিয়া, দেখাইলেন যে, বিবাহটা বড় গুরুতর ব্যাপার; অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন কাজে হাত

দিতে হয়। অতঃপর, দৃষ্টান্তস্বরূপ গণকঠাকুরের কোণ্ঠীগণনার ফলাফলটি প্রকাশ করিলেন। সবটা নহে,—কেবল মেয়ের বৈধব্যযোগটার কথাই कहিলেন। বাকি কথাটা অর্থাৎ পুত্রের ‘বিশ্বাক্ষের’ গণনাটা প্রকাশ করিলেন না। এমন না হইলে আর ‘নিষ্কামধর্ম’ কি? কিন্তু চতুর চূড়ামণি তখনই কথাটা চাপা দিয়া, ফিক করিয়া আর একটু হাসিয়া कहিলেন, “কিন্তু আমি ও সব কিছু বিশ্বাস করি না। মানুষ যদি মানুষের ভাগ্যফল বলিতে পারিত, তাহা হইলে আর সংসারে এত দুঃখ থাকিত না।”

অতঃপর বিষটা আর এক দিকে উদ্দীর্ণ করিয়া, নিষ্কামধর্মী कहিলেন, “তা বেশ ত, জামাই বাবাজী আমার ভাই-জীটিকে বিয়ে করে আমার দাদার মুখ উজ্জল করবেন! তা’ মহাশয়রা,—গণক ঠাকুরের কথাটা একটা কথার কথা,—কথা নিয়ে যেন আর কোন কথাত্তর না হয়!”

আবার সেই বক্রদৃষ্টির সহিত ঈষৎ হাসি ও লোকমণ্ডলীর প্রতি আবার একবার সেই অন্তর্ভেদী চাওনি! হরি হরি! সেই এক চাওনিতেই সমুদ্রপ্রমাণ বিষ উদ্দীর্ণিত হইল। ধীরে, অতি ধীরে, মধুর গতিতে, মৃদু হাসির সহিত এক একবার সেই লোক মণ্ডলীর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া নিষ্কামধর্মী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে হুর্ভাগ্য দত্তজের বংশে বিধাতা এক শোচনীয় ঘটনার সংঘটন করিলেন। তাহা বড়ই করুণরসাত্মক, বড়ই মৃগ্ধভেদী। ক্ষেমেই সে সকল কথা আलोচনা করিতেছি।

(৬)

এই নিকামধর্মী জীবটির নাম—হরকুমার ঘোষ। সুবাদে দত্তজের একরকম ভাই। কোন কাজ কর্ম নাই,—পৈতৃক ছ'-দশ বিঘা জমি আছে;—তাহাতেই কোন রকমে মোটা ভাত-কাপড়টা চলিয়া যায়।

এই নিকামধর্ম, কালে আবার সকামেও পরিণত হয়। হরকুমারেরও তাহাই হইল। ইঙ্গিতে-আভাসে-দত্তজের কন্ডার মাথায় বাজ ফেলিয়া, নিকামী মহাপুরুষ মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তার পরই আর এক ঘটনা! সেটা বিধির বিধান, কি প্রকৃতির প্রতিবিধান, ক্রমেই বুঝা যাইবে।

এ দিকে, বরপক্ষে, লোকমণ্ডলীর মধ্যে, মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। প্রথমে দুই একজনে ফুস্‌ফুস্‌ শুস্‌শুস্‌—চুপি চুপি—সংগাফাংগি,—তার পর তিলে তাল হইয়া সেই কথাটা গুরুপক্ষে দাঁড়াইল। মহা মুকুন্দদল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোকরা-বাবুদের দল পর্য্যন্ত মাথা নাড়া;—সকলের মুখেই ঐ একই কথা,—“উঁহ! এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না!”

স্বয়ং বর সুশীলকৃষ্ণ, কিন্তু এ আপত্তিতে একমত নহেন;—কথাটা তাহার ভাল লাগিতেছে না। চোক-মুখের চেহারা দেখিয়া, তিনি যে ইহাতে বিরক্ত হইতেছেন, এমনও বুঝা যায়। এমন কি, শেষে তিনি সেই বিশিষ্ট আত্মীয় বন্ধুটিকে (যিনি দত্তজের কন্ডাকে ‘পাকা’ দেখিতে গিয়াছিলেন) কহিলেন, “স্বরেশ, এ কি কেলেঙ্কারী হইতেছে?”

বন্ধু স্বরেশচন্দ্রও সেই সুরে কহিলেন, “আমিও তো তাই ভাবিতেছি! মল্লিক মহাশয়ের সকলই বাড়াবাড়ী।”

কিছু আর অধিকক্ষণ ছই বন্ধুকে মনের কথা কহিতে হইল না। এই সময়ে স্বয়ং মল্লিক মহাশয়, মুখখানা হাঁড়ীর মত করিয়া, মহা গরম হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। সুশীল ও সুরেশকেই অধিক আক্রমণ করিয়া কহিলেন, “আজকালের ছেলে গুলো যেন কি হ’য়েছে! ছ’ পাতা ইংরেজী প’ড়ে ধরাখানাকে সরানো দেখে! এত নাস্তিকপাষাণের দপ্পদপানীতে হিঁড়য়ানী আর থাকে কি রকমে?”

এই কথাটা বলিতে গিয়া, বুড়ো বিড়ির-বিড়ির করিয়া এক কথা শতবার আওড়াইল; সুশীল ও সুরেশকে দীর্ঘ করিয়া তুলিল। সুশীল একটু বিরক্তিভাবে কহিল, “তা আপনি অমন করিতেছেন কেন? কি,—চইয়াছে কি?”

বুড়া কপালে করাঘাত করিয়া একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “হবে আর কি? আমার মাথা আর মুণ্ড!”

সুশীল আর কোন উত্তর করিল না; মুখখানি নত করিয়া কিছু অসন্তুষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল। সুরেশ কহিল, “তা’ নাস্তিক পাষাণের দপ্পদপানীতে হিঁড়য়ানী গেল কি রকমে?”

বৃদ্ধ ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, “গেল কি রকমে! জ্ঞান না! দেবতা-বামন মান না; কর-কুণ্ডী বা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস কর না; অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎকে উড়াইয়া দাও;—এগুলো কি হিঁড়য়ানী, না খীষ্টানী?”

সুশীল ও সুরেশ বৃদ্ধের মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, বৃথা কথা-কাটাকাটিতে কোন ফল নাই। বুঝিলেন, নিষ্কাম-ধর্মী মহা সর্বনাশ বাধাইয়াছে।

ফলেও তাহাই হইল। বৃদ্ধ, সুশীলের খুল্লতাতে। উপস্থিত

তিনিই একমাত্র অভিভাবক। সুশীল ও সুরেশের একান্ত অনুরোধে, তিনি বিনা পয়সায় এ শুভকার্যে সম্মত হইয়াছিলেন। তা' বলিয়া ত, জানিয়া গুনিয়া আর তিনি আপন গ্রহ আপনি ডাকিয়া আনিতে পারেন না! বিশেষ, যে-সে বিষয় নয়, যেমন তেমন কথা নয়,—মেয়েটার অদৃষ্টে আছে বৈধব্য-যোগ! অন্তরে দুর্গানাম জপ করিয়া, বৃদ্ধ এ সংকল্প ত্যাগ করিলেন। ভ্রাতৃপুত্রকে কহিলেন, “বাবা সুশীল! আমার অবাধ্য হইয়া, আমার মনে বাধা দিও না। এমন অলক্ষণা কৃত্যর সহিত কিছুতেই তোমার বিবাহ হইতে দিব না। দাদা স্বর্গে গেছেন, আনি এখনও আছি। আমি থাকিতে তোমার অমঙ্গল দেখিতে পারিব না।”

বৃদ্ধের চক্ষু হইতে টস্‌টস্‌ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। সুশীল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বৃদ্ধের ভিতর একটা আঘাত লাগিল। সুরেশ ব্যথিত, চিন্তিত ও হতাশ হইলেন। মুখ ফুটিয়া কাহারও কোন কথা বলিতে সাহস হইল না;—বৃদ্ধের মুখের উপর কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না।

(৭)

ষড়পক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মহাত্মা নিদামধন্যী, “ওরফে হরকুমার ঘোষ মহাশয়, মহা দুঃখিতান্তরে কতাপক্ষে—বিবাহ বাড়াইতে উপস্থিত হইলেন। কারণ, নিদামধন্য ত দুই দিকেই পালন করা দরকার! কিন্তু তাঁর সে সময়ের সে বিমর্ষ ভাবটি দেখিলে, আমাদেরও দুঃখ হয়। দুঃখ হয় এই,

ভগবান এ সংসার এত সৌন্দর্য্যময় করিয়া, সয়তানধর্ম্মী মানুষ
সৃষ্টি করিলেন কেন ?

হরকুমার মহা বিমর্ষভাবে বিবাহ-বাড়ীতে দর্শন দিলেন ।
আনন্দের দিনে গুণধর খুল্লতাতে এরূপ বিমর্ষভাব দশনে,
প্রকাশ কিছু ব্যথিত হইল । ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, “কাকা মশাই,
আপনি ওরকম বিষম কেন ?”

ভগ্নস্বরে, অতি অস্পষ্টভাবে, দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে টানিতে,
খুল্লতাত কহিলেন, “আর বাবা !”

এক “আর বাবা” বলিয়াই খুল্লতাত বসিয়া পড়িলেন । কপালে
করাঘাত করিয়া পুনরায় কহিলেন, “আর বাবা ! সর্ব্বনাশ
হ’য়েছে ! দাদার মত এমন পোড়া-কপাল কোথাও দেখিনে !”

আবার সেই ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, যাতনা-জড়িত অস্পষ্ট কথা,
ও মধ্যে মধ্যে নানা ভঙ্গিমায় শিরে করাঘাত ! প্রকাশ
ভালর লক্ষণ বুঝিল না । ব্যাকুলভাবে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে
কহিল, “কি কাকা মশায় ! কি, হয়েছে কি ? কি,—শীঘ্র বলুন !”

“আর বাবা !”

গুণধর খুল্লতাত পুনরায় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ।
সেইভাবে আবার কহিলেন, “আর বাবা, তোকে আর বলবো
কি, বউকে ডাক, সব বল্ছি !” প্রকাশ আরও ব্যাকুলভাবে,
আরও হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিকলকণ্ঠে ডাকিল, “মা, মা !”

গলার আওয়াজ শুনিয়া, আওয়াজের সহিত ভয়-বিদ্বেষ-
ব্যাকুলতার সমাবেশ দেখিয়া, মাও স্বরিতপদে, বুক চাপিয়া
ধরিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন । হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কাম্পিত-
কণ্ঠে কহিলেন, “কি বাবা ?—কেন বাবা ?”

অতঃপর হরকুমারকে দেখিয়া কহিলেন, “একি ঠাকুর পো
যে! কি হয়েছে, ঠাকুর পো?”

“আর বউ!”

আবার সেই বিকট দীর্ঘনিশ্বাস! ভ্রাতৃজায়া তাহাতে ভীত
হইলেন। কহিলেন, “কি হ’য়েছে খুলে বল! দোহাই ঠাকুরপো!”

পুত্রকে কহিলেন, “বাবা, তুইও চুপ ক’রে রয়েছিস কেন?
আনার মাথা খাস্, বল!”

প্রকাশ মায়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়া, নীরবে ছই
ফোঁটা চক্ষের জল মুছিল।

হরকুমার আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতি
সংক্ষেপে কহিলেন, “সর্বনাশ হয়েছে! কে গিয়ে বর-কর্তার
কাণে তুলেছে যে, মেয়ের অদৃষ্টে বৈদ্য-বোগ আছে! বরকর্তা
সাই না শুনে মহা গণ্ডগোল বাঁদিয়ে তুলেছে। সবাই বেকৈ
বসেছে,—এখানে ছেলের বিয়ে দেবে না!”

“এঁয়া!” বলিয়া প্রকাশের মা বলিয়া পড়িলেন। “সে কি
কাকামশাই!” বলিয়া, প্রকাশও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। কাকা
মহাশয় উপদেশ দিলেন,—“আর বাবা, ভেবে আর কি করবে
বল? ভবিতব্য কে খণ্ডন করবে? তাঁদের কি বল,—তাঁদের
ছেলে, তাঁদের তো আর জাত বাঁবার ভয় নেই, কিন্তু তোমার-
আমার সে ভয় বিলক্ষণ আছে! বিশেষ মেয়ের গায় হুলুদ
দেওয়া হ’য়েছে। গায়ে হুলুদ দিবে, হিঁহর ঘরের মেয়েকে তো
আর চাঁদন রাখবার যো নেই! তাই তো, এখন উপায় কি?”

কথা শুনিয়া, প্রকাশের মা, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া কেলিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, “তবে কি হ’বে ঠাকুর পো?”

আমার যে জাত যায় ! প্রকাশ, তুই যা' বাবা ! তাঁদের পারে হাতে ধরে বুঝিয়ে বল গিয়ে ; ছঃখীকে দয়া করলে, ভগবান তাঁদের ভাল করবেন । ওরে, আমার এমন মাধে কে বাদ সাধলে রে !”

অভাগিনী, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন । প্রকাশও তাহাতে যোগ দিল । নিষ্কামধর্মী, আর তথায় অপেক্ষা করা নিরর্থক-বুঝিয়া, প্রস্থান করিতে কুরিতে কহিলেন, “প্রকাশ, কেঁদ' না ! ছিঃ বাবা, তুমি তো আর অবয় নও ! বরেরের কাছেও বাওয়া মিছে ! আমি তো আর বুঝতে বাকী রাধি নেই ! তুমি বরং অল্প চেষ্টা দেখ । আজকের লগ্নের মধ্যেই তোমাকে যে কোন ব্যক্তিকে ভগিনীসম্প্রদান করতে হ'বে ! নইলে তোমাদের ধর্মচ্যুত, সমাজচ্যুত হ'তে হ'বে । তুমি ত বাবা অবয় নও ।—এখন কান্না রেখে, বরের চেষ্টা দেখ । আমি এখন আসি ।”

সয়তান, “মাধে বাদ” সাধিয়া প্রস্থান করিল ।

কুমারী নলিনী, এই সময় সমবয়স্ক সঙ্গিনীদের সহিত, আনন্দ-আল্লাদ করিতেছিল । হঠাৎ তাহার অরণ হইল, “কাজলনতা” খানি ত তাহার কাছে নাই ! হঠাৎ বালিকার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল । তখনই এখান-ওখান সর্বত্র অনুসন্ধান করিল ; সঙ্গিনীগণও সকল স্থান পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল ;—কিন্তু হয় ! কোথাও সে মাদ্রলিক স্মৃতির সন্ধান পাইল না !

(৮)

নলিনী, মুখখানি চুন-মত করিয়া মার কাছে গেল। দেখিল, শতধারে মার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নলিনীর চক্ষু হইতেও, তাহার অজ্ঞাতসারে, টস্-টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, মা, আরও কাঁদিয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। কান্নার বেগ একটু প্রশমিত হইলে, নলিনী কাঁদ কাঁদ মুখে কহিল, “কাঁদিতেছ কেন, মা?”

এ প্রশ্নে মা, আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, “মা নলু! এমন পোড়া কপালীর পেটেও এসেছিলি! তোর ভাবনা ভেবে ভেবে, তিনি অকালে চলে গেলেন! মাধুপুরুষ তিনি, তাঁর স্বর্গবাস হয়েছে;—আমি পোড়া-কপালী, আমাকে এই সব দেখবার জন্তে, এখানে থাকতে হয়েছে। না রে! তোর অদৃষ্টেও শেষে এত ছিল?”

সংক্ষেপে, মা, একে একে সকল কথা কহাঁকে বলিলেন। নলিনী বুঝিল, তাহার জন্তই এত অনর্থ! বাণিকা মনে মনে কহিল, “হায়, আমি জননী-জঠরে মরিলাম না কেন? আমার জন্ত বাবা গেলেন, মার আমার অস্থিচর্য মার হয়েছে, দাদার আমার আহর্য-নিদ্রা উঠেছে! বুঝলেন, আমিই যত অনর্থের মূল! হায়, বাবা বেঁচে থেকে, আমি মলেম না কেন?”

বালিকা মুখখানি নত করিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল; আর মুখ বাহিয়া টস্-টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

প্রতিবেশী, আত্মীয়বর্গও এই সময়ে তথায় সমবেত হইল। এই দারুণ দুঃসংবাদে, সকলেই “হায় হায়” করিতে লাগিল।

(৯)

এদিকে হরকুমার, স্বকাৰ্য্য সাধন করিয়া, পুনরায় বর-কর্তাদের বাসা-বাটীতে অবিভূত হইল। কি-একটা মতলব আঁটয়া, কুক্ষিতকটাক্কে,—স্বাভাবিক বক্র-দৃষ্টি আরও বক্র করিয়া, তাহার সহিত একটু ‘কিক’ করিয়া হাসিয়া, বরকর্তার নজ্জুখে উপবেশন করিল। একটু ইতস্ততঃের পর, মস্তক কণ্ঠয়ন করিতে করিতে কহিল, “আর মল্লিক মশাই! ভাব্চেন কি? ভবিতব্য কে খণ্ডন করবে, বলুন? আপনি মহাশয়-লোক,—এখন যা হয় একটা অল্প উপায় করুন। এত দূর থেকে শিবাহ দিতে এসে তো আর কিরে যাওয়া সম্ভব হয় না! খরচ-পত্রও দেখাচ যথেষ্ট হ’য়েছে। তাই তো—”

হরকুমার বড়ই সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল,—“তাই তো,—বিধাতার কেমন বিড়ম্বনা দেখ?”

ইত্যাকার আরও অনেক বোল-চাল দিতে লাগিল। পরে যখন বুঝিল, ‘মতলব হাসিল’ হইয়াছে, তখন উষ্টিয়া দাঁড়াইল; কহিল, “তবে মল্লিক মশাই, বস্তুতে আজ্ঞা হয়।”

মল্লিক মহাশয় হরকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, “বান কোথায় ম’শাই! আনাদের একটা ‘কিনারা’ ক’রে দিন! আপনারা এতগুলি ভদ্রলোক থাকতে—এ ভদ্রসমাজে এসে কি, নিরাশ্বাস হ’য়ে যাব?”

“হাঁ, তা বটে ! কিঙ্ক—”

‘কিঙ্ক’ বলিয়া, হরকুমার ‘টোক’ গিলিল। টোক গিলিয়া, মৃৎ চিবাইতে চিবাইতে কহিল,—“কি জানেন ম’শাই, আমার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল নয়। লোকের সব সময় সমান যায় না। তবে মেয়েটি-আমার বড় লক্ষ্মী, পয়মস্ত। সাত নয়, পাঁচ নয়,—ঐ আমার আঁধার ঘরের মাণিক ! মা-আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী !”

মল্লিক মহাশয়, একাগ্রচিত্তে, কাণ খাড়া করিয়া, হরকুমারের কথাগুলো গিলিতে ছিলেন। যাই কথা থামিল, অমনি বুড়া “হাঁ হাঁ” করিয়া, বিশেষ ব্যস্ততাসহকারে, আহ্লাদে, সভা-সদবৃন্দকে—অর্থাৎ বর, বরদারী, আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে—কহিলেন, “ভাবনা কি—ভাবনা কি ? বার ভাবনা, তিনিই ভেবে রেখেছেন। তাই তো বলি, মা জগদম্মা কি মুখ তুলে চাবেন না ?”

তারপর বৃদ্ধ, সুরেশের সহিত সুশীলকে ডাকিয়া কহিলেন, “আর বাবাজী, ভাবনা কি ! এই দেখ, বুড়োদের এক আঁট্টা কথা মেনো ! কোথাকার একটা অলঙ্করণে মেয়ে খামকা ঘরে নিয়ে যাব ? কেন, মেয়ের ভাবনা কি ? এই ঘোষণা মহাশয়ের পরম রূপবতী একটি কথা আছে ; এখনই—আজিকার লগ্নেই শুভ-কার্য্য সমাধা হ’বে ! এই দেখ বাবাজীরা, কোন বিষয়ে অত উতলা হ’ও না ! উতলা হওয়া বড় দোষ।”

অতঃপর, হরকুমারের সহিত, মল্লিক মহাশয়ের সকল কথা শেষ হইল। হরকুমারের এক পরসী খরচ-পত্র নাই, মেয়ের গহনা-গাঁট—এমন কি, বিবাহের যাবতীয় খরচ-পত্রও, পাত্রপক্ষ হইতে সম্পন্ন হইবে।

তখনই মেয়ে দেখিতে যাওয়ার কথা হইল। ভার পড়িল,—
সুরেশচন্দ্রের উপর। সুরেশ একটু ইতস্ততঃ করিল।
কহিল, “আমি আর নাই দেখতে গেলুম। মল্লিক মশাই
ঝিঁঝিঁ লন না।”

‘মল্লিক। ওহে, আমি বলছি,—তুমি যাও না।’

(১০.)

এই সময় প্রকাশ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার
সেই আকুলি-ব্যাকুলি ভাব, চক্ষের সেই হতাশ-দৃষ্টি, মুখের সেই
বিষাদ-কালিমা দেখিয়া, সুশীল ও সুরেশের বুক ফাটিয়া বাইতে
লাগিল। অথচ, তাঁহারা মুখ ফুটিয়া, একটিও কথা কহিতে
পারিলেন না। হরকুমার, প্রকাশকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া
একটু অধিক ব্যগ্রতাসহকারে কহিল, “তবে মল্লিক মশাই,
কে মেয়ে দেখতে যা’বেন, আসুন। আর সময় নেই।”

“হাঁ, মশায়ের সঙ্গেই লোক পাঠাচ্ছি। ওহে সুরেশ, যাও
না! প্রসন্ন, তুমিও না! হয় ঠাঁর সঙ্গে যাও না! আঃ! তোমাদের
নিরে তো দেখছি, কোন কাজ-কর্ম্ চল না।”

প্রসন্ন নামক জনৈক প্রতিবেশী বরযাত্রী বিনীতভাবে কহিল,
“আজ্ঞে, যাচ্ছি। ওহে সুরেশ ভায়া, চল যাই।”

সুশীলকুমার জনান্তিকে সুরেশকে কহিলেন, “যাও ভাই,
আমার শ্রদ্ধের আরোজন করগে।”

সুরেশ, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সেইরূপ মুহূর্ত্তে কহি-
লেন, “আর ভাই, এদিকে দেখেছ?”

“কি ?”

সুরেশ, প্রকাশকে দেখাইয়া কহিল, “এই নেই হতভাগা ভাই ! বেচারী, তগিনীর বিবাহের দায়ে, কিরূপ বিবর্ণ হইয়াছে, দেখ ! বুঝি, এতক্ষণে, এ দুঃসংবাদ উহাদের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। ভাই, আমার মূখ দেখাইতে লজ্জা করিতেছে !”

সুশীল কহিলেন, “সুরেশ, আমিও কি মনে কর, আমাতে আছি ? কি করব ? উনি পুত্রহীন ;—মনে করবেন, বাবা নেই ব’লে আমি ঐর অবাধা হ’য়েছি। ভাই, বুঝ্লেম, বিবাহটা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নি।” তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস কৌলরা কহিলেন, “নাও, ঐর কথাই রাখ। আর ভাবিলে কি হ’বে ?”

সুরেশ কহিলেন, “সুশীল, যেতে যে পা সরে না, ভাই !”

এই সময় অতি কদম্বর একটু রাগতভাবে কহিয়া উঠিলেন—“সুরেশ, আমার কথাটা কি তোমাদের মনঃপুত হ’ল না ? তা’ হ’বে কেন ? নীচা তো নেই,—সুশীলের যা ইচ্ছা হয়, করুক ! কিন্তু আমার সঙ্গে এট পর্গাণ্ড—”

বলিতে বলিতে, বন্ধের গাউয়ন বহিয়া, দুটুকুটো পরম জন পড়িম। উহা দেখিয়া, সুশীল, ব্যাকুলভাবে সুরেশকে কহিল, “নাও ভাই, উহা’র কথাই রাখ। কাল-বায়ের আর হুনের চিটা সহিতে পারি না !”

বিনা-ব্যাকব্যয়ে, প্রসন্নকে সঙ্গে লইয়া, সুরেশ সেরে দেখিতে চলিল। অগ্রে হরকুমার, পশ্চাৎ পশ্চাৎ রমণ ও সুরেশ।

এতক্ষণে প্রকাশ, সকল রহস্ত বুঝিল। বুঝিল যে, তাহার কণের খুড়ো, তাহাদের নাথায় বাজ কেলিয়াছে ! প্রকাশের

মুকের তিতর আগুন জলিয়া উঠিল। কম্পিত-কণ্ঠে, কাদ কাদ মুখে কহিল, “ হর কাকা, হর কাকা—”

মুখ ফুটয়া সকল কথা বাহির হইল না। বালক মুক্তকণ্ঠে কান্দিয়া কেলিল। কাদিতে কাদিতে কহিল, “ হর কাকা, তুমি না আমাদের পরমায়ী? তোমার কাছে না না-আমার জাতরক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা ক’রে ছিলেন? হা ধর্ম! কোথায় তুমি? হর কাকা, বড় সাধে বাদ সাধিলে!”

হরকাকা, সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, মনে মনে প্রকাশের মুণ্ডপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিল। চরিত্র একবার মাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া, প্রকাশকে দেখিয়া, দুই কঁোটা চক্ষের জল মুছিলেন। স্থূল অধোবদনে বসিয়া রছিলেন।

ব্রহ্ম মল্লিক মহাশয়, এতক্ষণে বেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। এমন সময় প্রকাশ আসিয়া, তাঁহার পা ছ’ থানি জড়াইয়া ধরিল। কাদিতে কাদিতে আবেগভরে কহিল, “মহাশয়, হিন্দুর হিন্দু ক’রুন! কারপ্তের জাতি রক্ষা করুন! আমার ভগিনীর ধর্ম রক্ষা করুন! আপনি আমার পিতার কাজ করুন। দোহাই আপনার!”

মল্লিক মহাশয়, মুকুবিরয়ানা চালে কহিলেন, “ ওহ বাপু, তুমি ছেলে-মানুষ; সংসারের কিছুই বুঝ না;—তাই এমন কথা বলছ! কি জান,—এ’-যে-সে কাজ নয়—বিবাহ! এ বড় গুরুতর কাজ! এতে বাপু, অনুরোধ-উপরোধ চলে না। কি জান, এ হ’চ্ছে চিরকালের মদক্ষ! বিশেষ, জেনে শুনে, কে বল, কাল-কট সেবন করে? তোমার ভগিনীর কোম্পীতে যখন বৈধব্য-যোগ আছে, তখন কিছুতেই আমি এ সম্বন্ধে রুজি হ’তে পারি না। তোমরা অল্প চেষ্টা দেখ গে বাপু!”

প্রকাশ আরও কাঁদিল, আরও স্তব-বিনয় করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বুড়া, ঐ একই কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। তখন প্রকাশ, নিকৃপায় হইয়া, ভগ্ন মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল।



যুগ্মা সময়ে হরকৃষ্ণের মনের-মত দাখাইয়া, বর-পক্ষকে দেখাইল। সোণার মত—নির্মলা। অরেশ ও প্রদর দেখিল, নির্মলা তাই নির্মলাই—কঁচা সোণার মত রং, চাঁদপানা মুখ, স্বকর স্বকোমল বস্তুতঃ, দত্তজের কথা অপেক্ষাও হরকৃষ্ণের নৈবেদ্য হুঁশী, স্বরূপা, স্বলক্ষণা। তখনই বন্দন-কৃত্যদ্বারা আশীর্বাদ করিয়া, পাত্রপক্ষ, বাসার প্রত্যাগত হইল। হরকৃষ্ণ তখনই কল্পার গাত্র-হরিদ্রা-কাঁচা সম্পন্ন হইল, বিবাহের সমস্ত আয়োজনে ব্যাপৃত হইল। এদিকে প্রকাশ ও তাহার মা, সম্পূর্ণ নিকৃপায় হইয়া, তাম্র এক অশীতিবর্ষ রুগ্ন রক্তের হস্তে নলিনীকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল।

সন্ধ্যা হইল। দত্তজের বাড়ীতে বিবাহ-বাসর সজ্জিত হইল; এদিকে হরকৃষ্ণের বাড়ীতেও বিবাহের আয়োজন হইল। যুগ্মা সময়ে, দুই স্থলে দুই পাত্রের সমাবেশ হইল। যুগ্মা সময়ে, নিকৃপে, দুই শুভ উদাহকিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু দুঃখের মধ্যে, সম্প্রদানের সময়, নলিনীল দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইল ও চক্ষে জল দেখাঁ দিল। আর অণু সম্প্রদান-সভায়, নির্মলাকে

করিবার সময়, হরকুমারের হাও কাঁপিয়া উঠিল ; ও মন্ত-
ন করিবার সময়, সে তিক নিপরাত কথা বলিয়া ফেলিল ।
ল, সেই সময়, অন্তরে, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন ।
অনুষ্ঠ, কাল ও কর্ম্যকালের অপূর্ণ সময় হইয়া গেল !

(১২)

স্মিতব্য কে খণ্ডন করিবে ? 'গর্গনা'র ফলাফল হাতে হাতে
। বিবাহের এক সপ্তাহ পরেই, দুই নলিনী পুষ্পটি শুক-
ল—বাঁদিকা, ভাস্কর-মাত বৈধব্য-মুকুটে মস্তক অধিষ্ঠিত
প্রকাশ ও তাহার মার বুকের এক এক খানি হাড়

দিকে ?—এদিকে, হুশানের বিবাহের একমাস পরেই,
সেই সংসারের একমাত্র বন্ধন, বিপদ-সমুদ্রে ক্রব-
নসম্পন্ন তনয়া,—সেই স্বর্ণপ্রতিমা নিম্নলি আঁকা
গা ত হইল । গুণালকৃষ্ণ বিপন্ন হইলেন ; হর
কুমারের গা গল হইল । শেষ, সত্য সত্যই গুণাল-
কুমার হরকুমারের জঠরানলের নিবৃত্তি হইতে লাগিল ।
সত্যভাগ্য উন্নয়নবেশে, একদিন দত্তজের বাড়ীতে উপস্থিত
নলিনীকে দেখিয়া কহিল, “মা, সত্যি লক্ষ্মী ! তোমার
পাং আমার হাতে হাতে ফলিয়াছে ! মা, বলো দাত,
কি কারণ ? তুই কি মা আমার সেই প্রাণের

তনয়াদিমে, নলিনীকে জোড়ে লইতে চেষ্টা

করিল। এইরূপ গৃহস্থের দ্বাবে দ্বারে ভ্রমি-
ভাগ্যের দিনপাত হইতে লাগিল। যাহার
হত-গায়া তাহাকেই তনয়া-ভ্রমে আদর করে-
সজ্জান অবস্থায়, “মারে, কোথায় গেলি রে” :
চীৎকার করিতে থাকে !

আর সুশীলকৃষ্ণ ? সুশীলকৃষ্ণেরও জীব
অল্প বয়সে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, আশা, উদ্য-
নিরাশা-সলিলে নিমগ্ন হইল। তিনি চিরদিনই
কিছুতেই পুনর্বিবাহ করিলেন না।

এই ঘটনার ঠিক এক বৎসর পরে,
কার্যোপলক্ষে একবার হরকুমারের বাটীতে
তিনি বাটীর বাহিরে পাদচারণ করিতেছি
নলিনী, বর্ষায়মী প্রাতঃবোশনাদের সহিত, প্রা-
ছিল। হঠাৎ উভয়ের চারি-চক্ষের মিলন হই-
ল। তাহাকে কখন দেখে নাই,—কত কি-জ্ঞা-
পের হৃৎকম্পের ১৩৩র আশ্রয় মলিনা উঠিল
কহিলেন, “ভগবান ! কি পাপে আমি
বঞ্চিত হইলাম ?”

নলিনীর কণ্ঠ হঠাৎ উদয় হইল
না, না,—নারাদিন ! ~~দগরে বঙ্গ দাড়া~~

